বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

ডক্টর শ্রীযদুনাথ সরকার	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীনাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীহরিহরণ চক্রবর্ত্তী

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীরাজমোহন ভট্টাচার্য্য

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীঋষিপতি সরকার

হিসাব-পরীক্ষক

ইউ. এন. চৌধুরী এণ্ড কোং — শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ৯। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, ১২। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১৪। শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৯। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২০। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ গুহ, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ ঘোষ, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

CUL-HO4898-59 P 36229

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৯ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সূচি

১। বরদামঙ্গল—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১
২। বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ... ১৩
৩। তান্ত্রিক কার্য্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ... ৩৫
৪। 'গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা
করীন্দ্র দাস—সেখ ফয়জুল্লা নহেন—শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ ... ৩৮

59

পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড :
(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ১০৲ + ১২৷৷০
সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙালী-জীবন
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) ৫৲
১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র : ১ম-২য় ভাগ ৫৲ + ২৷৷০
১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্ত্তমান
শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫৲
আধুনিক-বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল স্মরণীয়
সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা
করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

পূজা-পার্বণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কাগজের মলাট ॥ তিন টাকা

বোর্ডে বাঁধাই ॥ চার টাকা

প্রাচীন পট ও মূর্তি-চিত্রে সমৃদ্ধ

শারদোৎসবের শুভদিবস সমাগতপ্রায়। কিন্তু গ্রাম নিরানন্দ, দেশ অবসন্ন। শুক্লোদরে, ছিন্নবসনে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে উৎসব হয় না।—তবু দেশময় উৎসবের আয়োজন হইবে। দুর্গোৎসব করি সত্য, কিন্তু ইহার উৎপত্তি ও স্বরূপ অনুধাবন করি না। এই পূজার সহিত বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত। মনীষী গ্রন্থকার সেই স্মৃতি, উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ, এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।—গ্রন্থের প্রথমাংশে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, সরস্বতীপূজা ও 'বার মাসে তের পার্বণ' বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হিউএনচাঙ

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কাগজের মলাট ॥ আড়াই টাকা

বোর্ডে বাঁধাই ॥ তিন টাকা

বহু চিত্রে শোভিত

তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শনের বাসনায়, বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসন্ধানে, চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএনচাঙ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ষোল বৎসর কাল ভারত পরিক্রমার পর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাস বিবৃত হইয়া আছে।—বর্তমান গ্রন্থে লেখক, সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া, হিউএনচাঙের ভ্রমণকাহিনী ও তাঁহার দৃষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন।

নেহরু ০ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বোর্ডে বাঁধাই ॥ আড়াই টাকা

চিত্রসূচী

অশ্বপৃষ্ঠে জওহরলাল

জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ

জওহরলাল ও গান্ধী

'নেহরুর জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই···প্রকৃত জীবনীলেখককে দেখাইতে হইবে কোন্ সামান্য লক্ষণের বলে বহির্জগতের চোখে তিনি ভারতবর্ষের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। সে ইতিহাস রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তি-নেহরুর চেয়ে, কর্মী-নেহরুর চেয়ে, রাজনীতিক-নেহরুর চেয়ে নেহরুর ব্যক্তিত্ব অনেক মহৎ—অনেক চিত্তাকর্ষক তো বটেই।···কর্মী ও রাজনীতিক নেহরু অর্ধপ্রচ্ছন্ন।'—এই গ্রন্থে লেখক নেহরুর ব্যক্তিরূপ-বিকাশের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

"যাঁহারা নেহরুর অতিভক্ত, আর যাঁহারা বিনা যুক্তিতেই নেহরুকে উড়াইয়া দেন, এই দুই দলের লোকেরাই এই বইখানি পড়িলে লুপ্তদৃষ্টি ফিরাইয়া পাইবেন।"—যুগান্তর

বাংলার লেখক

প্রথম খণ্ড

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বোর্ডে বাঁধাই ॥ চার টাকা

আলোচিত লেখকগণের চিত্রে শোভিত

বাঙালীর আত্মোপলব্ধির প্রধান উপায় সাহিত্য—বাঙালী জাতি ও বাংলার সংস্কৃতি লইয়া আমাদের গৌরব, প্রীতি ও বেদনাবোধ, তাহা অনেকাংশে বাঙালী সাহিত্যিকদেরই সৃষ্টি। ইহাদের অনেকের সৃষ্টি আজ অমনোযোগের প্রদোষচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে—লেখক সেই সব সাহিত্যকীর্তির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাংলার মনীষার প্রতিনিধিস্থানীয় এই কয়জনের মনোজীবনী বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত—শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী ০ গ্রন্থনবিভাগ ০ ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫৯

বরদামঙ্গল

(শ্রীশ্রীবরদেশ্বরীর ইতিবৃত্ত)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জিলার অন্যতম প্রধান পরগণা বরদাখাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীশ্রীবরদেশ্বরী অন্যূন ৪৫০ বৎসর যাবৎ জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বরদাখাতের ইতিহাসের সহিত এই পীঠ-দেবতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ৺বরদেশ্বরীর নামানুসারেই ফার্সি "বলদাখাল" শব্দটি পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। পাঠান অধিকারের পূর্ব্বে এই পরগণা সুপ্রাচীন "শিরচাইল" রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান, চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সেঙ্গ সমতটের পূর্ব্বোত্তর দিকে যে "শি-লি-চ-ট-ল" রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "শিরচাইল" হইতে অভিন্ন।

৺বরদেশ্বরীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আমরা নানা কৌতুকজনক কাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। মুখে মুখে প্রচলিত সে সকল কিম্বদন্তীর মূল প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকাইল-নিবাসী স্বর্গত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট "বরদামঙ্গল" নামক একটি হস্তলিখিত পুথি (পত্রসংখ্যা ৫৫) প্রাপ্ত হইয়া আমরা তন্মধ্যে ৺বরদেশ্বরীর এবং বরদাখাত পরগণার ইতিহাস বিষয়ে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার "দ্বিজ নন্দকিশোর" শ্রীকাইলের সন্নিহিত "রোয়াচালা" গ্রাম-নিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটিমাত্র প্রতিলিপিই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিলিপির সমাপ্তি [৫৫ ক পত্রে] "ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ২৬ মাহে ভাদ্র রোজ ভৃগুবাশরে শায়ং সময়ে পুস্তকং সমপ্তঞ্চেতি পোস্তকং স্বাক্ষরং [হস্তা] শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণ ॥ ॥ সাকীং পরগণে বরদাখাত মৌং রোয়াচালা গ্রামে ভাসিন্দা।" ইংরাজী তারিখ হয় ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ খ্রী। গ্রন্থকারের বংশীয় লোক এখনও এই গ্রামে বিদ্যমান আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, চাঁদপ্রতাপ পরগণার রোয়াইল গ্রাম হইতে কাশ্যপ গোত্র, পুণ্ড্রীলাল শ্রোত্রিয় কৃষ্ণবল্লভ রায়ের পুত্র ধনঞ্জয় রায় কোন দুর্ঘটনাবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া শ্রীকাইল আসেন। তৎকালে রোয়াচালা গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য ছিল, তত্রত্য বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ "রামকেশব রাউত" ধনঞ্জয়ের পুত্র শান্তিরামকে সসম্মানে ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্রই নন্দকিশোর। বরদামঙ্গল গ্রন্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ; দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এই ভণিতা আছে [৫০ক পত্র]—

শান্তিরামদ্বিজসুত নন্দকিশোর নাম। বরদাখাত দেষমধ্যে রোয়াচালা গ্রাম ॥
সেই দ্বিজে লিখিলেক বরদামঙ্গল পোতা। কলিতে কালিকাপরে আর যত মিত্যা ॥

শান্তিরাম শ্রীকাইলের ভৈরববংশীয় রামজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং নন্দকিশোর ভৈরববংশের দৌহিত্র বিধায় ৺বরদেশ্বরীর ইতিবৃত্ত সম্যক্ জ্ঞাত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নন্দকিশোর প্রৌঢ় বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, ১১৯৫ সনে [১৭৮৮ খ্রীঃ] Patterson সাহেব বরদাখাত পরগণা জরিপ করিয়া সমস্ত নিষ্কর ভূমির যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই "মীনাহি" কাগজে [এখনও কুমিল্লা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে] রোয়াচালা গ্রামস্থ দুই জনের নাম আছে, রামকান্ত ও নন্দকিশোর। ইহারা উভয়েই শান্তিরামের পুত্র। নন্দকিশোরের তিন পুত্র—রাজকিশোর, গৌরকিশোর ও রুদ্রকিশোর। গৌরকিশোরের তিন পুত্র—কমলকিশোর, নীলকমল ও অরুণোদয়।

বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের ন্যায় এই গ্রন্থও স্বপ্নাদেশে রচিত :—

কলিভব তারিতে কালি বরদারূপি হইলা।
অষ্টভুজা নিলবর্ণা ছিকালি বিরাজিলা ॥
আদেসিলা সপ্নবাণি বরদামঙ্গল খানি
লিখিতে পোস্তক তোমা আদেশ করিলা।
বরদামঙ্গল পোতা কেমতে লিখিব মাতা
ভাবিতে চিন্তিতে মন হৈল উচকলা ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভে কবি অকপটে লিখিয়াছেন—"সমস্কৃতং ন জানামি মূর্খ ভবতি নিশ্চয়। তবানুগ্রহণঞ্চৈব ভাসিতং বরদমঙ্গল ॥" [সপ্তম শ্লোক]। গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি দেখিলে গ্রন্থকারের উক্তি বিনয় মাত্র মনে হয় না। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য অতি নগণ্য, পক্ষান্তরে ইহা একটি অমূল্য ইতিবৃত্তমূলক দুর্লভ গ্রন্থরূপে বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করার যোগ্য।

প্রথম অধ্যায়

মহাবলী ত্রিপুর অসুরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, দেবগণ শিবসন্নিধানে যাইয়া, তাঁহার নির্দ্দেশে কালিকার স্তব করেন।

দেবের সাক্ষ্যাতে আসি কহিল বচন।
ত্রিপুর অসুর আমি করিব নিধন ॥
* * *
শিবে বোলে বরদা তুমি কালিমূর্ত্তি হইয়া।
অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরি অসুর বধ গিয়া ॥
* * *

শদাসিবে কহে দেবী সোমহ বচন।
তোমার কৃপায় হইল অসুর নিধন॥
প্রিথিভিতে থাক তুমি বরদা নাম ধরি।

*　　*　　*

আমা ভক্ত আছে এক দ্বিজ কিত্তিভাস।
তার তপে হবে তোমার লোকেত প্রকাষ॥ [১-৫ পঙ্ক্তি]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাহাড় মুলুক ছিল গঙ্গার পশ্চিম ধারে।
কালিপুর নাম গ্রাম অতি মনুহরে॥

*　　*　　*

সেই গ্রামেতে ছিল **কিত্তিভাস ব্রহ্মচারী**।
পরম সাধক সেই শাস্ত্র অনুসারি॥

*　　*　　*

কালিপুর গ্রামের উত্তরে পর্ব্বত শিখড়ে।
কানন ভিতরে তবে গেল দ্বিজবরে॥

*　　*　　*

এহি মতে পঞ্চ বৎসর তপ কৈল।
তথা চ-যে দেবি তাকে সদয় মা হইল।

*　　*　　*

তপ সুনি নারায়ণি, নিজমূর্ত্তি ধরে পুনি, অষ্টভুজ মুণ্ডমালা গলে।
এক হস্তে খড়্গধারি, আর হস্তে হেলসারি, আর হস্তে রুধির কোটরা।
আর হস্তে অস্ত্র যত, তাহা বা কহিব কথ, দিগাম্বরি নিছে ভোলানাথ।
সিংহ বাহন করি, অসুর মারছে ধরি, মিলবর্ণ হইলা বরদা।

*　　*　　*

তাহা সুনি বরদামহি, তোমাতে সরুপ কহি, বরিসেক অন্তরে পাইবা।
রাঢ়দেসে হবে ভঙ্গ, লোক জাবে তোমা সঙ্গ, পুর্ব্বদেসে জাইবা চলিয়া।
বরদা আমার নাম, তোমাতে কহি অনুপাম, বরদাখাত পরগণা মধ্যে।
বিসারা গ্রামের নাম, তাহাতে চলিয়া জাম, কাননের মধ্যেত থাকিব। [৫-৮ পঙ্ক্তি]

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্রি হৈল নিপাত জবন অধিকারি।
বাদসাহি আমল হৈল রাজা সব মারি॥

বলতকার করি লোকের জাতি নষ্ট করে।
বাদসাই নিসান উড়ে নগরে নগরে॥

* * *

রাঢ়াড় দেসের কথা করহ শ্রবণ।
রায়শ্রীপ্রতাপরাজা দুই ভাই ছিল।
বাদসাই হাঙ্গামা দেখি কাতর হইল॥

* * *

দয়া হৈল নারায়ণি, কহিল আকাসবাণি, কিণ্ডিভাস দিজ পাসে জায়।
কিণ্ডিভাস নাম সুনি, হরিস হইল পুনি, ব্রহ্মচারি কুলপুরোহিত।

* * *

তাহা সুনি হরিসে কহিল ব্রহ্মচারি।
পূর্ব্বে আমা বর দিছে বরদা ইশ্বরি॥
রাঢ়াড় দেশেত তুমি হইব নিশ্চয়।
বঙ্গরাজ্য পূর্ব্বদেস অরণ্যমধ্যয়ে॥
সেই দেসে বরদাকালি প্রচার হইব।
পূর্ব্ব রাজ্যে রাজা তুমি তোমাকে করিব॥

* * *

বরদাখাত নাম রাজ্য অধিক বিসেষ।
অরণ্য কানন সব লোক নাই তায়ে॥
মনিস্তের গতি নাই গহিন কানন।
বরদা কালিকা তাথে পাইবা দরসন॥

* * *

নানা জাতি লোক সব পরিবার লইয়া।
জাত্রা করে পূর্ব্বদেসে হরসিত হৈয়া॥

* * *

ব্রাহ্মোণ কাহেস্ত বৈদ্য জতেক আছিল।
সব সখা আদি করি ছত্তিস জাতি লইল॥

* * *

বিস্তর চলিল নৌকা নাহি লেখা জোখা।
রাঢ়াড় মুলুক সুস্ত হইল এতদিনে॥
এহি মতে জায়ে নৌকা গঙ্গাস্রোত বাহিয়া।
সাগরসংগ্রমতির্থ লাগ পাইল গিয়া॥

* * *

উজাইয়া ভায় নৌকা উত্তর পুরবা কোন।

*　　*　　*

সতমুখি গঙ্গা দেবি দক্ষিণে রহিল।

*　　*　　*

ব্রহ্মপুত্র নদ বায়ে উত্তরমুখি হইয়া।

*　　*　　*

হেন কালে নৌকা সব পূর্ব্বমুখি হৈল।

*　　*　　*

মেগনাদ নদির পূর্ব্বপাড়ে গেল।

বরদাখাতনামে দেস তখনে মিলিল॥

*　　*　　*

বনমধ্যে অগ্নি দিল বরদা স্থরিয়া।.....

সেই অগ্নি ছিল একবিংসতি দিবস।..... [৮-১২ পত্র]

চতুর্থ অধ্যায়

এক সরোবর তাথে অতি মনোহর।...

সারি২ করি গ্রাম বিসারা-নাম থুইবা। (দৈববাণী)

*　　*　　*

সরোবর পশ্চিম ধারে রাজপুরি কৈল। তাহার দক্ষিণে কির্ত্তিবাসপুরি হৈল॥
সকলি ব্রাহ্মণ তবে একগ্রাম হৈল। শুদ্র বৈর্শ্য আদি ছত্তিস জাতি রৈল॥
মধ্যে পর্ব্বসরোবর গ্রাম চতুর্ব্বিতে। বিসারানগরি নাম রাখে হরসিতে॥
রাহাড়দেস ছাড়িয়া আসিছে যত প্রজা। সকলির ঠাই করি দিল মহারাজা॥
দক্ষিণে **ফেনাই** নদি উত্তরে **খেয়াই**। এহার মধ্যে বসতি লোক করিল সামাই॥
বরদাখাত মৈষ্যদেস বরদার স্থান। পর্ব্বতে কালিদেবি হইছে (অধি)ষ্ঠান॥
পুষ্পমাল ধরি দ্বিজ জলে ডুব দিল। অঘাত জলের মধ্যে এক রাত্র ছিল॥

*　　*　　*

ক্রমে বরদাদেবী, "বরদেশ্বর" শিবলিঙ্গ, "রামচন্দ্র" শালগ্রাম এবং দ্বিভুজ "বাসুদেব" মূর্ত্তি কীর্ত্তিবাস সরোবর হইতে তুলিল।

রায়শ্রীপ্রতাপরাম মন হরসিতে। বরদার মণ্ডপঘর বান্ধিল ত্বরিতে॥

বৈশাখ মাস অমাবস্যা শনিবারে দিনে।
পূজা করে বরদা কালি অতিভক্তি মনে॥
সাক্ষাৎ দেবীর নিকট কীর্ত্তিবাস,
জেইমত পূজার বিধি লিখিয়া লইল। **অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র** দেবী তাহে দিল॥

(১২-১৭ পত্র)

পঞ্চম অধ্যায় (রায় শ্রীপ্রতাপকথা)

দক্ষিণে কেনাই নদি উত্তরে খেয়আই। এহি দেসের মহারাজা হৈল দুই ভাই॥
পূর্ব্বসিমায় পর্ব্বত পশ্চিমে মেগনাদ। এহার মধ্যে রাজা দুই মনেত সার্দ্বাদ॥

* * *

কত দিন পরে তারপ হইল মত্যতা।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করহে সদায়ে। চুরি পরদার কার্য্য সদায়ে করয়ে॥
একদিন মদ্যপানে বিভোর হইয়া দুই ভাই বরদার মন্দিরে ঢুকিয়া
পূজারত কীর্ত্তিবাসকে আহত করিয়া,
সিংহাসন হতে কালি তোলে ততক্ষণ।
পরসে বরদা দেবির স্তেত কুষ্ঠ হৈল। তথা.চ বর্ব্বর মূঢ় কীছু না বুজিল॥

* * *

নিজালয়ে নিয়া কালি সিংহাসনে বসাইল।

* * *

আপনে বসিল কালি পূজা করিবার।

* * *

ক্রোধ করি বলে কালি বলি না লইলা। কালিকে পুড়িব বলি আনল জ্বালিলা॥

* * *

ক্ষতক্ষণে প্রজ্বলিত হৈল হুতাসন। রাজপুরি ভস্মরাশি অগ্নিতে দাহন॥
গ্রামনগর পুড়ি কৈল হাড়খাড়। না দহিল অগ্নিয়ে কীর্ত্তিভাসের জে পুর॥
তথা চয় দুই অসুর জ্ঞান নাহি মনে। কালিকে সংহার আমি করিব এখনে॥
সেই অস্ত্র উলটিয়া পড়ে তার সিরে। দেবকোপে আপনা অস্ত্রে মরিল অসুরে॥

[১৮-২২ পত্র]

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্ত্তিবাস মনের দুঃখে এবং ক্রোধে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি নদীতে বিসর্জন দিল এবং পরে প্রত্যক্ষ দেবীর সান্ত্বনায় এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যে (জন্মে২ না ছাড়িবা আমাবংশ ইত্যাদি) আশ্বস্ত হইয়া সমস্ত মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্ব হথে অধিক প্রভা হইল কালিকার। জেবা জেই মানস করে সিদ্ধি হয়ে তার॥
রায় শ্রীনির্ব্বংস হইল অরাজগ দেস। এতদিনে রাজবংস হইলেক শেষ॥
দেসে২ মাতবর লোক জতেক আছিল। বাটয়া করিয়া তারা জমিদার হৈল॥
বরদাখাত দেস তবে বার জিলা হইল। পোথক বাড়য়ে দেখি নাম না লিখিল॥…

[২২-২৪ পত্র]

সপ্তম অধ্যায়

দেবীর বরে কীর্ত্তিবাসের পত্নী "প্রভাবতী"র "জগন্নাথ" নামে এক পুত্র হইল। দেবীর নিকট ভবিষ্যদ্বক্তি শুনিয়া কীর্ত্তিবাস দেহরক্ষা করিয়া, "ভৈরবানন্দ" নামে সাক্ষাৎ ভৈরবরূপে দেবীপদতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জগন্নাথ "কালিপদে লিপ্ত পিণ্ড শ্রাদ্ধ না করিল।" এক বৎসর পরে পত্নী প্রভাবতীও মুক্তি লাভ করিল। [২৫-৩০ পত্র]

অষ্টম অধ্যায়

জগন্নাথের পুত্র হইল "মৃত্যুঞ্জয়" এবং কিছু কাল পরে জগন্নাথ স্বর্গী হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদ্‌সার পুত্র 'জাঙ্গির খাঁ' পূর্ব্বদেশে আসিয়া "জাঙ্গেরনগর" সহর স্থাপন করিয়া দেশ জয় করিতে লাগিল।

বার ওমরা আসিয়াছিল বাদসার সহিতে। বার জন চলি গেল মহিম করিতে।

* * *

খাঞ্জা খাঁ কোড়র খাঁ দুই মগল ছিল। বহু সর্ঞ্জ লইয়া তারা বরদাখাত আইল॥

বিশারার কাচারি তানা কোরক করিল। চৌধুরি ময়ুমন্দার সব পলাইয়া গেল॥

প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থানকালে তাহারা দুই জন বরদেশ্বরীর পূজার কোলাহল শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পূজা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিল।

তাথে এক ব্রাহ্মণ আছিল অনুপাম। **ভাগরাতলি বাড়ি তার বানিরাম নাম॥**

বানিরাম ছিল সেই দরবার ভিতর। শুনিয়া ইসব কথা কাকে ধর ধর॥

কালিভক্ত বাণিরায়ে সমাই স্থানে কহে। কালি এহি স্থানে রাখম উচিত না হয়ে॥

বাণিরায়ে বোলে সোন আমা নিবেদন। ভাগরাতলি আমা বাড়ি করহ গমন॥

তাহাতে সরতকালি দসমি উপস্থিত। শনিদিবস জাত্রা করি চলিল ত্বরিত॥

দশমি জোগে তান বাড়ি তিন রাত্রি ছিল। নানা বিধিমতে পূজা তিন দিন কৈল॥

এ সময়ে ভৈরব মৃত্যুঞ্জয়কে দেবী আকাশবাণীতে জানাইল—

দশমী প্রভাতকাল, আমা লই ঘরে চল, মহিমা দেখিব সর্ব্বলোকে।

বাণী রায়ের কাতরোক্তিতে ভৈরব প্রতি বৎসর "চারি রাত্র" বরদেশ্বরীকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া পূজা করিতে স্বীকৃত হইল। [৩০-৩৩ পত্র]

নবম অধ্যায়

৺বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্যে সসৈন্যে মোগল জমীদারদ্বয় পরাস্ত হইল এবং তাহারা দেবীপূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া

বিসারার সপ্তগ্রাম বিত্তি করি দিল।

কত দিন পরে তাহা নদিয়ে ভাঙ্গিল॥ [৩৩-৩৭ পত্র]

দশম অধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয় রত্নেশ্বরের কন্যা "সুভগা দেবী"কে বিবাহ করেন এবং "গঙ্গারাম" নামে এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহারা যৌবনারম্ভে উভয়ে মুক্তি লাভ করেন। গঙ্গারামও বিবাহ করিয়া তিন পুত্র লাভ করেন :—

এহি তিন ভৈরববংস আছে ছিকালিতে। [৩৮-৪১ পত্র]

একাদশ অধ্যায়

পূর্ব্বে দেবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বিশারা নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। গঙ্গারামের প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী তাহার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিলেন :—

এহি ঠাঞি নদি ছিল অতি খরতরে। তাথে এক মৎস আছে বচি নাম ধরে॥
দির্গ সপ্ত যোজন মৎস্য প্রহস্থ দুইপর। বহুদিন অবদি মৎস রহিছে সাগর॥
সেই মৎস উপরে বালুরে বান্ধে চর। লড়িতে না পাড়ে মৎস বড়ই ডাঙ্গর॥
বহুকালে সেই মৎস গায়ে ঝাড়া দিব। এ কারণে এহি পুরি নদিয়ে ভাঙ্গিব॥
সাগরে জাইবে মতস বহুকাল পরে। এহি মর্ম্মকথাখানি কহিল তোমারে॥
দেবি বোলে ভৈরব তুমি সোনহ বচন। আমাকে লইয়া তুমি করহ গমন॥

* * *

ভাগরাতলি নামে গ্রাম বানিরায়ে ছিল। সুনিয়া নদির সম্বাদ কালিপুরে আইল॥

* * *

বানিরায়ে বোলে আমি কথায়ে জাইব। ছাড়িয়া বিসারাদেষ কোনথানে রহিব॥

* * *

ভাগরাতলি উত্তরপুর্ব্বে ভামগ্রাম নাম। সেই গ্রামে বাড়ি বান্ধ সোন গুণধাম।
ভাগরাতলি গ্রাম তবে নদিয়ে ধরিল। বানিরায়ে বাড়িঘর ভামগ্রামে কৈল॥

* * *

বটবৃক্ষমূলেত বরদা নামাইয়া। কৌতুক দেখিতে বসে হরসিত হৈয়া॥
তাতে সে বচিকামৎস লেজ ঝাড়া দিল। গভ্যির নদির জল খলখলি হৈল॥
দির্গ দুই দিন পথ প্রহস্থ হাড়াই পর। জলজন্তু কত তার উদর ভিতর॥
প্রথমে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে কালিপুর। তার পরে ভাঙ্গিল রম্য পদ্ম সরোবর॥
তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম ব্রাহ্মোনমগরি। তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম কির্ত্তিভাসপুরি॥
তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে ভাগরাতলি। বদন ভরিয়া সবে বোল কালি২॥
তার পরে ভাঙ্গিল বরদা অন্তপুর। পাসানের মন্দির প্রাচির হৈল চুড়॥
এহি মতে ভাঙ্গীল গ্রাম নগর সারি২। তার পরে ভাঙ্গিলেক বিসারানগরি॥
দির্গে দুই দিন পথ পাসে হাড়াই পর। দুই দণ্ডে ভাঙ্গিল তাহা নদি খরতর॥
বিসারার বিসগ্রাম নদিয়ে ভাঙ্গিল। অন্ত২ দেসের কথা তাহা না লিখীল॥

পরে দেবীর আদেশে ছিকালির "মধ্যগ্রামে" অগ্নিযোগে জঙ্গল ভস্ম করিয়া নূতন মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। বঙ্গদেশ ও ছিকাইলের মাহাত্ম্যবর্ণনায় এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়। শেষ দুই অধ্যায়ে মহাকালী ও লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রতাপ রায় ও ধন্যমাণিক্য

বরদামঙ্গলে উল্লিখিত বরদাখাতের আদি জমীদার প্রতাপ রায়ের নাম "রাজমালা"র প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬ খৃঃ) তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে "বঙ্গদেশ" জয় করিয়া,

গৌড়াধিপতি রাজ্য বরদাখাত আদি। রাজায়ে কাড়িয়া লৈল হইয়া বিরোধী॥
বরদাখাতে জমিদার প্রতাপ মহামতি। গৌড়ে না মিলিয়া রাজা সঙ্গে করে প্রীতি॥
(রাজমালা, ৯৭ পৃঃ এবং দ্বিতীয় লহর ১৩ পৃঃ)

হস্তলিখিত "প্রাচীন রাজমালা"য় আছে,—

গৌড়েশ্বরের আছিল বরদাখাত। তাহারে কাড়িয়া লৈল করিয়া বিবাদ॥
তাহার জমীদার প্রতাপ রায় মিলে। গৌড়ে না মিলিল সে যে আপনার বলে॥

অন্য প্রতিলিপিতেও পাওয়া যায়—

বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে। নিজবাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে॥
প্রতাপ রায় নামে তার জমিদার ছিল। গৌড়েতে না মিলে সেই আইসে নিজদল॥

ধন্য মাণিক্যের সহিত প্রতাপ রায়ের মিলন অনুমান ১৫০০ খ্রীঃ হইয়া থাকিবে। রাঢ়দেশে যে হাঙ্গামার ফলে প্রতাপ রায় বহু লোক জন সহ নৌকাপথে পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ গৌড়ে হাব্‌সী রাজাদের অত্যাচারকালে ঘটিয়াছিল। ঐ সময়েই মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপেও 'রাজভয়' উপস্থিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিখ্যাত হুসেন সাহার রাজ্যারোহণের [১৪৯৩ খ্রীঃ] পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অরাজকতা চলিয়াছিল। "শূদ্র" রাজা প্রতাপ রায় তাঁহার "কুলপুরোহিত" [বাৎস্য গোত্র, ঘোষাল গাঞি] কীর্ত্তিবাস ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় বরদাখাত পরগণায়, সম্ভবতঃ রাঢ়দেশের "বিশারা" গ্রামের নামানুসারে বিশারা নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারই একাংশে পদ্মসরোবর হইতে উদ্ধৃত "বরদেশ্বরী" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে শ্যামগ্রাম হইতে ঐ মূর্ত্তি অপহৃত কিম্বা অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপর ৺কাশীধাম হইতে অনুরূপ মূর্ত্তি আনিয়া ছিকাইল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শববাহনা অথচ সিংহবাহিনী এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং তাঁহার অষ্টাক্ষর মন্ত্র কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না—সাধকশ্রেষ্ঠ "ভৈরবানন্দ" কীর্ত্তিবাসের ইহা এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। রাজমালার উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকায় বরদামঙ্গলের প্রতাপ রায় ঘটিত বৃত্তান্তের সারাংশ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তদনুসারে ১৫২৫-৩০ খ্রীঃ প্রতাপ রায় মতিচ্ছন্ন হইয়া নিহত হইয়াছিলেন অনুমান করা যায়। ভোলাচঙ্গ গ্রামের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ "প্রতাপ রায়" প্রায় এক শতাব্দী পরবর্ত্তী এবং ভিন্ন ব্যক্তি; তাঁহার অষ্টম প্রপৌত্র "রামবল্লভ দেব" ১১২৭ সনে [১৭২০ খ্রীঃ] দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

মোগল অধিকার

তৎপর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বরদাখাত পরগণা '১২ মিলা'য় বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারের হস্তগত হয়। জাহাঙ্গীরনগর সহর স্থাপিত হওয়ার পর "খাজা খাঁ" [বা খাজা বেগ] ও "কোড়র খাঁ" (বা কোড়র বেগ) নামক দুই জন মোগল সম্ভ্রান্ত পুরুষ বরদাখাত পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্য সন্দেহ নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে [১৬১০-২০ খ্রীঃ] এই ঘটনা স্থাপন করা যায়। তখন কীর্ত্তিবাসের পৌত্র মৃত্যুঞ্জয় এবং সুবিখ্যাত শ্যামগ্রামের রায়বংশের আদিপুরুষ "বাণী রায়" বিদ্যমান ছিলেন এবং এই সময় হইতেই "বরদেশ্বরী শারদীয় পূজার ৪দিন রায়বংশের গৃহে নীত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগৌরব খ্যাপন করিতেছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় "শ্যামগ্রাম" নামক গ্রন্থে বাণী রায় ও তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন। বাণী রায়ের আবির্ভাবকাল সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠানুক্রমিক প্রপৌত্র "মনোহর রায়" (ওরফে জানকীবল্লভ রায়) গঙ্গামণ্ডলের জমীদার মির্জ্জা মহম্মদ জাফর হইতে ১১৬৩ সনে [১৭৫৬ খ্রীঃ] ওয়াইদপুর গ্রামে নিষ্কর ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোহরের পৌত্রদ্বয় উদয়চন্দ্র ও অনুপনারায়ণ ১২০২ সনে এই ভূমির বিবরণ দাখিল করিয়াছিলেন। এতদনুসারে বাণী রায়ের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে [১৬০০-১৬৫০ খ্রীঃ মধ্যে] নির্ণীত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে নিশ্চিত।

বরদামঙ্গল গ্রন্থানুসারে খাজা খাঁই বরদেশ্বরীর প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি—"বিশারার সপ্তগ্রাম"—দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের ও মোগলাধিকারের তারিখ ঠিক ১০২৩ সন [১৬১৬ খ্রীঃ] বলিয়া অনুমান করার কারণ আছে। ১২০২ সনে [১৭৯৫ খ্রীঃ] শ্রীকাইলের ভৈরববংশীয় ৩০ জন দখলকার দেবোত্তর সম্পত্তির যে পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে পাওয়া যায়, "মনুহর খা জমিদার, অধন্ জে মজা আলি ও মজা বাখর আলি ও মজা হুসেন আলি জমিদার এহানগ পীতামহ মজা মাহাম্মদ বাকর জমিদারের পূর্ব্বের" কাগজে, অন্যূন ৬০ খানা বিভিন্ন গ্রামে, মোট ৩৫৸৵৯।০ জমী "বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী"র নামে দেবোত্তর দান করেন। সনদের তারিখ—"১০২৩ সন পীতা পীতামহের ঠাই শুনিয়াছি কিছু কম ২০০ বৎসর হইব।" [কুমিল্লা কালেক্টরীর ৪৩৯নং হকীকত লাখেরাজ] এই "মনুহর খাঁ" নিঃসন্দেহ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্র সুবিখ্যাত Munawwar Khan," যিনি সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম অভিযানে [১৬৬৫-৬৭খৃঃ] সাহায্য করিয়াছিলেন (*J. A. S. B.*, 1906, pp. 405-17) কিন্তু ১০২৩ সনে (১৬১৬ খ্রীঃ) এই মনোহর খাঁর জন্মই হয় নাই; কারণ, নবপ্রকাশিত "বাহার-ই-স্তান" গ্রন্থানুসারে মনোহর খাঁর পিতামহ 'মুসা খাঁ'র ১৬২৩-২৪ সালে মৃত্যুকালে মনোহর খাঁর পিতা 'মাসুম খাঁ'রই বয়স ছিল মাত্র ১৮-১৯ (*I. H. Q.*, Dec. 1935, P. 671), সুতরাং ভৈরববংশে পুরুষানুক্রমে প্রচারিত তারিখটি খাজা খাঁ ও কোঁড়র খাঁ প্রদত্ত প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তির বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। বরদাখাত পরগণা ঈশা খাঁর অধিকৃত ২২ পরগণার অন্তর্ভুক্ত

ছিল। ইস্‌লাম খাঁর মোগলবাহিনীর সহিত মুসা খাঁর সঙ্ঘর্ষ ১৬১১ খ্রীঃ ঘটে। ঐ সময়ে বরদাখাতেও মোগল অধিকার সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সঙ্ঘর্ষের স্মৃতি এবং প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। "মির্জ্জা তাস বেগ" নামক একজন মোগল সেনাপতি "মোচাগারা" (মুরাদনগরের নিকট) গ্রামে ছাউনী করিয়া রাজাচাপীতলার তেলী রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন—"রণছোপ" প্রভৃতি গ্রামের নাম এখনও এই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাস বেগ তাঁহার পুত্রের নাম "ফতে বেগ" রাখিয়াছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ পরে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে যাত্রাপুর গ্রামে "খোসবাশ" বিত্ত লাভ করেন, সনদের তারিখ "৩৩ জলুশ ২৮ শফর" (১৬৮৮-৮৯ খ্রীঃ)। এই সনদ আমরা দেখিয়াছি। যাত্রাপুরের সম্ভ্রান্ত 'মির্জ্জা' বংশ এখনও এই খানেবারি ভোগ করিতেছে।

বিশারা হইতে ছিকাইল

অনুমান ১৬৪০ খ্রীঃ কীর্ত্তিবাসের প্রপৌত্র গঙ্গারামের সময়ে "বিশারার বিশ গ্রাম" নদীতে নিমজ্জিত হয়, এই সম্পূর্ণ নূতন তথ্য বরদামঙ্গলের অতি অদ্ভুত "বচিকামৎস্তের সমুদ্রযাত্রা" কাহিনীর সারাংশরূপে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং অন্যূন ২৫০ বৎসর বিশারার পাষাণ-মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়া ৺বরদেশ্বরী ছিকাইল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 'বরদামঙ্গল' গ্রন্থে এবং সমস্ত প্রাচীন দলিলপত্রে এই গ্রামের নাম 'ছিকাইল' বলিয়া লিখিত হইয়াছে, পরে ইহা বিশুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান 'শ্রীকাইল' নাম প্রচারিত হয়। গ্রামটী পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমি হইতে অনেকটা উচ্চ, ইহা অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। ভৈরববংশই এই গ্রামের আদিম অধিবাসী। গঙ্গারামের তিন পুত্র রাঘব, রামেশ্বর ও সনাতন হইতে তিন ধারার সৃষ্টি হইয়াছে—বর্ত্তমানে কীর্ত্তিবাস ব্রহ্মচারী হইতে ১১-১৪ পুরুষ চলিতেছে। গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ বিদ্যমান আছে—মৌদ্‌গল্য গোত্র, নয়দাসের সন্তান। এই বংশীয় কৃতী পুরুষ (গৌরচন্দ্র দারোগার পিতা) জগন্নাথ রায় প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বরদেশ্বরীর বর্ত্তমান পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পত্নী 'সর্ব্বেশ্বরী' বরদেশ্বরীর সাক্ষাৎ অনুগ্রহপাত্রী ছিলেন।

শ্রীকাইলের ভৈরববংশ ব্যতীত বরদাখাতের দুইটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ বিলুপ্ত 'বিশারা' সমাজের স্মৃতি বহন করিতেছে। আমরা তাঁহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্যামগ্রামের রায়বংশ ঃ বরদামঙ্গল আবিষ্কার ও নূতন গবেষণার ফলে এই বংশের আদিকথা নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 'বাণী রায়'ই প্রথম মোগল আমলে এদেশে আসেন ('শ্যামগ্রাম,' পৃঃ ৫১-৩)। কিন্তু বরদামঙ্গলে দেখা যায়, মোগল অধিকারের পূর্ব্বেই বাণী রায় বিশারার অন্তর্ভুক্ত 'ভাগরাতলি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বিশারার সহিত এই গ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বরদেশ্বরীর নির্দ্দেশমতে

ভাগরাতলির উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত 'অতি খিল রিল ঝিল' শ্যামগ্রাম নামক স্থানে বাণী রায়ই উঠিয়া আসেন। 'ভাগরাতলি' নামটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, বাণী রায়ের পিতামহও এই দেশের অধিবাসী ছিলেন। ঢাকা জেলায় মহেশ্বরদি পরগণার উত্তরে 'নৌলাকোট' নামে একটি নাতিবৃহৎ জোয়ার আছে। তাহার আদিম ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী ভরদ্বাজগোত্রীয় 'ভৌমিক' বংশ তদ্দেশে এখনও সম্মানিত। এই বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণানন্দ রায়, তৎপুত্র হরি রায়, তৎপুত্র বনমালী মিশ্র ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত রায়। একটি প্রাচীন কুরচীনামায় শ্রীমন্ত সম্বন্ধে পাওয়া যায় "তস্য দ্বৌ পুত্রৌ, কন্যৈকা **তদ্বিবাহকৃত বরদাখাৎ হৃদয়ানন্দ রায় তৎপুত্র রূপনারায়ণ রায়।**" এই রূপনারায়ণ রায়ের (সংক্ষেপে রূপ রায়ের) পুত্রই বাণী রায় বটে ('শ্যামগ্রাম,' পৃঃ ৬৫)। উক্ত শ্রীমন্ত রায়ের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ আমাদের সম্পর্কিত। হৃদয়ানন্দ রায় খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৫২৫-৫০ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং তিনি এদেশে অতি সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করায় বুঝা যায়, তাঁহার পিতাই সম্ভবতঃ প্রতাপ রায়ের সমসময়ে এ দেশে প্রথম আসিয়া বিশারা সমাজের গৌরব বৃদ্ধ করেন। বাণী রায়ের পুত্র শ্রীবল্লভ রায়ের সময়ে শ্রীকাইল হইতে ৺বরদেশ্বরীর যাতায়াত বিষয়ে রাজাচাপীতলার তেলীরাজবংশীয় "অঙ্গদ রায়ে"র সহিত ব্রাহ্মণ রায়বংশের ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং অঙ্গদ রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বরদাখাত পরিত্যাগ করিয়া সোনারগাঁয়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন। অঙ্গদ রায়ের বংশে প্রবাদ আছে, তাঁহারা পরগণার ৷৵০ অংশের ইজারাদার ছিলেন এবং বাকী ।৵০ শ্যামগ্রামের রায়বংশের ইজারা ছিল।

চাপীতলার ভট্টাচার্য্যবংশ। উল্লিখিত অঙ্গদ রায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ছিলেন এবং তাঁহার মাতার কল্যাণার্থে একটি 'স্বস্ত্যয়ন' কর্ম্মে নিযুক্ত করার জন্য চাপীতলার ভট্টাচার্য্য-বংশীয় অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী 'নরসিংহ বাচস্পতি'কে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া ৭ দিন আটক রাখিয়া তাঁহার স্বীকারোক্তি আদায় করেন। নরসিংহ বাণী রায়ের সমসাময়িক; তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'ভট্টিকাব্যে'র লিপিকাল ১৫৪৯ শকাব্দ (১৬২৭ খ্রীঃ) এবং ১০৯৫ সনে (১৬৮৮) অতি প্রাচীন বয়সে পুত্র পৌত্র সহ 'রাজাচাপীতলা' গ্রামে আসিয়া তদানীন্তন জমীদার মির্জা মাহাম্মদ বাখরের নিকট ৵১৫ নিষ্কর ভূমি দান পাইয়াছিলেন। (১৫৫৯নং হকীকত লাখেরাজ দ্রষ্টব্য)। নরসিংহের প্রপিতামহ [সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের 'জ্ঞাতিভ্রাতা'] 'নন্দনন্দন ন্যায়পঞ্চানন' প্রথম রাঢ়দেশ হইতে, প্রতাপ রায়ের সমসময়ে, 'বিশারা' আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র যদুনন্দন সার্ব্বভৌম এবং পৌত্র কৃষ্ণানন্দ শিরোমণিও বিশারার অধিবাসী ছিলেন। বিশারা সমাজে এই বংশের পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠার সূচক একটি প্রাচীন ছড়া প্রচলিত আছে :—

আগানগর ধোবাচাইল, তারা না জানে পরব পাইল।
বিশারার যে সম্বাদ আইল তবে ভিজা আউল্যা চাইল।

বিশারা ধ্বংস হইলে কৃষ্ণানন্দের পুত্র উক্ত নরসিংহ বাচস্পতি প্রথম 'ব্রাহ্মণ চাপীতলা' গ্রামে উঠিয়া আসেন—ঐ গ্রামে 'ভট্টাইজের দীঘি' নামে একটী প্রাচীন জলাশয় তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তৎপর তাঁহার অঙ্গদ রায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষ এবং রাজাচাপীতলায় আগমন উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরুষানুক্রমিক প্রবাদের সহিত বরদামঙ্গলের উক্তির আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীকাইলের ভৈরববংশ এই বংশের মন্ত্রশিষ্য বটে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সুপণ্ডিত ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বিদ্যাপতির এক বিস্তৃত পদাবলীসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির নামে যে অনেক অবিদ্যাপতির পদ চলিতেছে, তাহা পদাবলীসাহিত্যে পারদর্শী ৺সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন মনীষী দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে লোচন কবির রাগতরঙ্গিণী (দরভঙ্গা বীণা প্রেস, ১৯৩৪) এবং ৺শিবনন্দন ঠাকুর এম. এ. সঙ্কলিত মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী (মৈথিলী-সাহিত্য-পরিষদ্, লহেরিয়া সরায়, ১৯৪১) প্রকাশিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় রাগতরঙ্গিণী হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদের অনেকের ভণিতা পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, হয় ত অন্য রাগতরঙ্গিণীর পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যাপতির নাম ছিল, তবে তাঁহাকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তবে গুপ্ত মহাশয় যখন পদকল্পতরুর নয়টি পদের শেখর ভণিতা স্থলে কবিশেখর ভণিতা গড়িয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইতে সঙ্কুচিত হন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে ভণিতা পরিবর্ত্তন (হয় ত সরল বিশ্বাসে) অস্বাভাবিক নহে (দ্রষ্টব্য—সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ২১৫ পৃ.)।

ক। আমি এক্ষণে রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা পরিবর্ত্তনসমূহ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—

(১) গুপ্তের ৪৮৪ নং (বিদ্যাভূষণের ৪৯৮ নং, ছাপার ভুলে ৪৯৭ নং) পদের ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি নব কবিসেখর
পুহবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা॥

কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে আছে (৬৭ পৃঃ)—

ভণই জসোধর নব কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহা।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক তাঁহা॥

এই সাহ হুসেন বাঙ্গালার বিদ্যোৎসাহী সুলতান আলাউদ্দীন হুসয়ন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অঃ), বিদ্যাপতি সেই সময় জীবিত ছিলেন না। যশোধর খান নামক এক বাঙ্গালী কবি একটি ব্রজবুলি পদে হুসয়ন শাহের প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশরাজ খান॥

কবি যশোধরের কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। কিন্তু যশোরাজ খান সুপরিচিত। এক্ষণে নিশ্চিত যে, পদটি বিদ্যাপতির নহে। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, যশোধর যশোরাজের ভ্রান্ত পাঠ কি না। উভয়েরই পদ ব্রজবুলিতে এবং উভয়েই হুসন শাহের সমসাময়িক। সম্ভবত কবির নাম যশোধর, সংক্ষেপে যশ এবং রাজ খান উপাধি। তুলনীয় গুণরাজ খান।

২। গুপ্তের ১৯ নং (বিদ্যাভূষণের ৬৩ নং) পদের ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি পূরব পুনতহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংহ
লখিমা দেইকর কন্ত রে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৭২) পাইতেছি—

গজসিংহ ভন এহ পুরব পুনতহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম
অসমতি দেইকর কন্ত রে॥

খুব সম্ভবত এই নৃপ পুরুষোত্তম মিথিলেশ্বর ভৈরব সিংহের পুত্র। তিনি উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম নহেন (১৪৭০-১৪৯৭ খ্রীঃ)। গজসিংহের আরও একটি পদের ভণিতা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইহা (১৯ নং পদ) তালপত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণীতে আছে। তালপত্রের পুথি এক্ষণে অদৃশ্য। সুতরাং তাহার কি পাঠ ছিল, তাহা আবিষ্কার অসম্ভব।

৩। গুপ্তের ৬৩৫ নং (বিদ্যাভূষণের ৬৪১ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
মন ধীরজ ধরু রে।
অচিরে মিলত তোর প্রিয়তম
মন দুখ পরিহরু রে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৬৮ পৃঃ) আছে—

গজসিংহ কহ দুখ ছাড়ত
সুনহ বিরহি জন রে।
নৃপ পুরুষোত্তম সহি রহ
তেহিঁ দয়াঞে মিলু রে॥

গজসিংহের আর একটি পদ রাগতরঙ্গিণীতে (৫৮ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে নৃপ পুরুষোত্তমের স্থলে 'কুমর সিরি গজসিংহ' উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি (গুপ্তের ৪১৮ নং পদে) 'হাসিনি দেবিপতি গজসিংহ দেব'এর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই গজসিংহ মিথিলার রাজবংশীয় ছিলেন।

৪। গুপ্তের ১৬ নং (বিদ্যাভূষণের ৬১ নং) পদের ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি গাবে।
রড় পুন গুণমতি পুনমত পাবে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৭ পৃঃ) আছে—

কবি রতনাঞী ভাণে সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥
মিলু রতি মদন সমাজা দেবল দেবি লখন চন্দ রাজা।

কবি রতন (রতনাঞী) বিদ্যাপতির উপাধি হইতে পারে না। কবি রতনের আর একটি পদ গুপ্তের হরগৌরী পদে (৫০২ পৃঃ) এবং বিদ্যাভূষণের ৯১৬ নং পদে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ রাগতরঙ্গিণীতেও (১০৫ পৃঃ) আছে। কবি রতনের স্তুত রাজা লখনচন্দের দুইটি চণ্ডীবিষয়ক পদ রাগতরঙ্গিণীতে (৮৮ এবং ১০৯ পৃঃ) আছে। তিনি কে ছিলেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

৫। গুপ্তের ৬০ নং (বিদ্যাভূষণের ৮ নং) পদের ভণিতা—

দানকলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপতি হিন্দু সুরতান রে।
মেধা দেবিপতি রূপ নরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে॥

রাগতরঙ্গিণীর (১১২ পৃঃ) ভণিতা—

দান-কলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দু সুলতানে।
মেধা দেই পতি রূপনরাএন
প্রণবি জীবনাথ ভানে॥

কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতির উপাধি বটে। কিন্তু ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সুরতানএর সহিত মিলের অভাবে ধরা পড়ে।

৬। গুপ্তের ৫৯ নং (বিদ্যাভূষণের ৭ নং) পদের ভণিতা—

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
বিদ্যাপতি ভন সারে।
কংস দলন নারায়ন সুন্দর
মিলল নন্দ কুমারে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (১০০ পৃঃ) আছে—

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
গোবিন্দ-বচন সারে।
সোরম-রমন কংস নরাএন
মিলত নন্দকুমারে॥

এই কংসনারায়ণ মিথিলার রাজা ছিলেন। তিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন (*J. A. S. B.* 1903, p. 19)। তাঁহার সময়ে বিদ্যাপতি বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদ নেপালের পুথিতে (গুপ্তের ৪৭৯) এবং রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাগতরঙ্গিণীর ৯৭ পৃষ্ঠার পদে কংসনারায়ণ নসিরা সাহ সুরতানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি যে গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহ (১৫১৯—১৫৩২ খ্রীঃ অঃ), তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভণিতাটি এই—

সুমুখি সমাদ সমাদরে সমদল
নসিরা সাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি
কংস নরাএন ভানে।

কংসদলন নারায়ণ এই কংসনারায়ণ হইতে পৃথক্। বিদ্যাপতি-রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মিথিলা-রাজবংশীয় চন্দ্রসিংহকে "রিপুরাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণ" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ইহারই সংক্ষেপে কংসদলন নারায়ণ। তিনি কংসনারায়ণের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ পিতামহের সমকালীন। তাঁহার স্ত্রীর নাম লছিমা। কংসনারায়ণের স্ত্রীর নাম সোরম। ইহা বিদ্যাপতির পদ হইতে জানা যায়। মিথিলেশ্বর ভৈরব সিংহেরও উপাধি কংসনারায়ণ ছিল বলিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন (বিদ্যাপতি, ৩০ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ)। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীদের নাম ছিল জয়া এবং অসমা।

৭। গুপ্তের ৪৮ নং (বিদ্যাভূষণের ৭২ নং) এবং কীর্ত্তনানন্দে ভণিতা—

বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গাব।
বড় পুনে রসবতি রসিক রিঝাব॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৭ পৃঃ) আছে—

কংস নরায়ন কৌতুক গাবৈ,
পুনফলে পুনমত গুণমতি পাবৈ।

৮। গুপ্তের ৫২৩ নং (বিদ্যাভূষণের ৫৩৭ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি ভন কংস নারাএণ
সোরম দেই সমাজ।

রাগতরঙ্গিণীতে (১০২ পৃঃ) ভণিতা আছে—

দাস গোবিন্দ ভন কংস নরাএন
সোরম দেই সমাজ।

দাস গোবিন্দ কংসনারায়ণের বিনয়সূচক বিশেষণ। এই পদ তাঁহারই রচিত, বিদ্যাপতির নহে।

৯। গুপ্তের ১২৬ নং (বিদ্যাভূষণের ১২৯ নং) পদের ভণিতা—

কবি বিদ্যাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংহ রস জানে
নর কাহ্নে লো।

রাগতরঙ্গিণীর (৯৫ পৃঃ) ভণিতা—

ভবানী নাথ হেন ভাণে,
নৃপ দেব জত রস জানে।
নব কানুহে লো॥

১০। গুপ্তের ৭৯২ নং (বিদ্যাভূষণের ৭৮৫ নং) পদের ভণিতা—

ধৈরজ ধরু বিদ্যাপতি ভান।

রাগতরঙ্গিণীতে (৯৮ পৃঃ) আছে—

ধৈরজ কর ধরণী ধর ভান।

সুতরাং পদটি ধরণীধরের, বিদ্যাপতির নহে।

১১। গুপ্তের ৩১৭ নং (বিদ্যাভূষণের ৩০৪ নং) পদের ভণিতায় আছে—

ভনই অমি কর　　সুনহ মধুর পতি
রাধা চরিত অপারে।
রাজা সিব সিংহ　　রূপ নরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে॥

রাগতরঙ্গিণীতে ভণিতা (৮৫ পৃঃ)—

ভনই অমিঅ কর　　সুনু মথুরাপতি
রাধা চরিত অপারে।
রাজা সিব সিংহ　　রূপ নরাএন
লখিমা দেই কণ্ঠহারে॥

এই পদটি অমিঅ করের (অমৃত করের)। লখিমা দেই কণ্ঠহার (লক্ষ্মী দেবী কণ্ঠহার) শিব সিংহের বিশেষণ। অমৃত করের আরও দুইটি পদ মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীতে (৬৮ এবং ৮২ নং) উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি শিব সিংহের মন্ত্রী চন্দ্র করের পুত্র ছিলেন।

১২। বিদ্যাভূষণের ৩৩ নং পদের ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগর
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর।

রাগতরঙ্গিণীতে (৪৫ পৃঃ) ভণিতা—

কবি শেখর ভন অপরূব রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি।

গুপ্ত মহাশয় (৩৪ নং পদে) এই ভণিতাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই কবিশেখর দৈবকী-নন্দন সিংহ। তিনি গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই পদ বিদ্যাপতির হইতে পারে না।

১৩। গুপ্তের ৫৭৬ নং (বিদ্যাভূষণের ৫৮৩ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি কবিবর এই গাব।
সকল অধিক ভেল মনমথ ভাব॥

রাগতরঙ্গিণীর (১১৫ পৃ.) ভণিতা—

রসময় শ্যাম সুন্দর কবি গাব, সকল অধিক ভেল মনমথ ভাব।
কৃষ্ণ নরাএণ ঈ রস জান, কমলাবতি পতি গুনক নিধান॥

এই পদটি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। তিনি কোনও কবিতায় কমলাবতীপতি কৃষ্ণ-নারায়ণের উল্লেখ করেন নাই। এই কৃষ্ণনারায়ণ মিথিলার রাজবংশীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির নাম ভণিতাতে প্রকাশ শ্যামসুন্দর। ইঁহার আর কোনও পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

১৪। গুপ্তের ৩৬০ নং পদ ভণিতাবিহীন। তাহা রাগতরঙ্গিণীর (পৃ. ৪৮) হইতে গৃহীত। সেখানে এই পদের পর লিখিত আছে—"ইত্যাদি রাজঃ শ্রীনিবাসমল্লস্য"। সুতরাং ইহা রাজা শ্রীনিবাস মল্লের রচিত। তিনি কে, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত তিনি মল্লভূমির রাজা ছিলেন।

১৫। গুপ্তের ৭১২ নং পদ ভণিতাবিহীন। তাহা তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত বলা হইয়াছে। কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে (১০২ পৃ.) তাহা দৃষ্ট হয়। তাহার ভণিতা—

মধুসূদন ভন মনে অবধারি
কী ধৈরজে নহি মিলত মুরারি।

সুতরাং ইহা মধুসূদন নামক কবির পদ।

খ। আমি এক্ষণে পদাবলীর ভণিতা বিচার করিব। গুপ্ত মহাশয়ের অবলম্বিত নেপালের পুথি, তালপত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণী এবং মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বিদ্যাপতির উপাধিগুলি নির্দ্দেশ করিব।

১। কবিকণ্ঠহার, সুকবিকণ্ঠহার, বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার, সরস কবিকণ্ঠহার—এই উপাধিগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত চারি পুস্তকেই পাওয়া যায়। ইহাদের অতিরিক্ত কীর্ত্তনানন্দের ও

মিথিলার পদেও পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

২। সরস কবি, সরস কবি বিদ্যাপতি—উপরি উল্লিখিত চারি পুস্তকেই এই উপাধি দেখা যায়। সুতরাং এই ভণিতাযুক্ত পদগুলি আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

৩। অভিনব জয়দেব। তালপত্রের পুথিতে এবং মৈথিলী বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ পদাবলীতে দেখা যায়। মাত্র পাঁচটি পদে এই উপাধি আছে। গুপ্তের নং ২২৭, ৫৫৩, ৫৯৯ এবং মৈথিলী বিদ্যাপতির ৫০ ও ৭৯ ক পদে। গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর ৫২০ পৃষ্ঠার পদের ভণিতা সুকবি নব জয়দেব। এই পদগুলিকে আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

৪। বিদ্যাপতি। এই ভণিতার পদগুলি বিচারসাপেক্ষ। নবকবিশেখর, কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়, রায় শেখর, কবিরঞ্জন—এই ভণিতাগুলির কোনও পদ (দুইটি ব্যতীত) পূর্ব্বোল্লিখিত প্রামাণিক কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের অনেক পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি প্রভৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের বিদ্যাপতির পদাবলীতে নির্বিচারে এইগুলি গৃহীত হইয়াছে। নব কবিশেখর, কবিশেখর, শেখর, রায় শেখর, শেখর রায়, কবিরঞ্জন ভণিতার সমস্ত পদ বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে বাদ দিতে হইবে। ইহাতে ৫৪টি পদ বাদ পড়িয়া যাইবে। গুপ্তের ৪৮৪ নং পদে নবকবিশেখর তালপত্রের পুথিতে যে যশোধর স্থলে ভ্রমে বিদ্যাপতির নামের সহিত উপাধিস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে রাগতরঙ্গিণীর প্রমাণে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। গুপ্তের ৩৪নং পদ রাগতরঙ্গিণী হইতে কবিশেখর ভণিতা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এই কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ, বিদ্যাপতি নহেন।

গ। (১) সম্পাদক গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, তালপত্রের ও নেপালের পুথি দুইটিতে সমস্ত পদই বিদ্যাপতির। এই জন্য তাহাদের ভণিতাহীন পদগুলিও বিদ্যাপতির পদাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে। তালপত্রের পুথি যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার একটি প্রমাণ—যশোধর স্থলে বিদ্যাপতি পাঠ গ্রহণ, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও প্রমাণ দিতেছি। গুপ্তের ৫৬৬ নং পদটি উমাপতির পারিজাতহরণ নাটকে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা উমাপতির রচিত। কিন্তু তালপত্রের পুথিতে উমাপতি স্থলে বিদ্যাপতি ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, গুপ্তের ৩১৭ নং পদটি অমৃত করের, কিন্তু তাহাতে ভ্রান্ত পাঠ "সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে" ব্যবহার দ্বারা বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। গুপ্তের ৫০৯ নং পদটি সিংহভূপতির এবং ৭৮৩ নং পদটি পঞ্চাননের। তাহা ভণিতা হইতে স্পষ্টত জানা যায়। ৭১২ নং পদে ভণিতা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, তাহা মধুসূদন কবির। পূর্ব্বে আরও দেখান হইয়াছে যে, তালপত্রের পুথি

হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ১৬, ১৯ এবং ৬০ নং পদগুলি যথাক্রমে কবিরতন, গজসিংহ এবং জীবনাথের, কিন্তু সেগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। তালপত্রের পুথি অপেক্ষা অবশ্য নেপালের পুথি অনেকটা প্রামাণিক। তাহাতেও কিন্তু অন্য কবির পদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুপ্তের ১৬৩, ৩২২, ৪৭৯ এবং ৫০১ নং পদ লওয়া যাইতে পারে। এই চারিটি পদ যথাক্রমে লক্ষ্মীনাথ, ভানু, কংসনারায়ণ ও রুদ্রধরের—যেমন ভণিতায় স্পষ্ট আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশুদ্ধ সংস্করণের জন্য তালপত্রের ও নেপালের পুথির ভণিতাবিহীন পদগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। তবে অন্য প্রমাণে যদি কোনও পদ বিদ্যাপতির বলিয়া জানা যায়, তবে তাহা অবশ্য গ্রহণ করা হইবে, যেমন নেপালের পুথি হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ৯২, ২১৮, ৪৪৪, ৫৮৮ ভণিতাহীন পদগুলির মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীতে (৩৫, ২৭, ৩৯, ৪৫ নং পদে) বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ২৪০ নং পদের বিদ্যাপতির ভণিতা এই শেষোক্ত পুস্তকের ৭০ নং পদে আছে। গুপ্তের সংস্করণে তালপত্রের পুথি, নেপালের পুথি এবং উভয় হইতে উদ্ধৃত ভণিতাহীন পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১, ১০৩ এবং ৪। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি পদের বিদ্যাপতি ভণিতা পুস্তকান্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই মোট ১৩৮টির মধ্যে ১৩৩টি পদ সন্দেহজনক বলিয়া বাদ দেওয়া উচিত।

(২) এতদ্ভিন্ন সম্পাদকগণ পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পদসংগ্রহ-পুস্তক হইতে ভণিতাহীন ৫৬টি পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে গ্রহণ করিয়াছেন। পদের সংখ্যা বাড়ান ভিন্ন তাহাদের লওয়ার কি কারণ আছে, জানি না। আমার বিবেচনায় বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে এই ৫৬টি পদ অবশ্য বর্জ্জনীয়।

ঘ। আমি এক্ষণে অন্যের ভণিতাযুক্ত পদগুলির পরিচয় দিতেছি। এগুলি যে বিদ্যাপতির নহে, ভণিতাই তাহার প্রমাণ। সুতরাং এই পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে বাদ দিতে হইবে। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের (নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত) পদসংখ্যা দিব।

১। কবি চম্পতি ৩৪৭, ৪০১, ৪২০। সম্ভবত চম্পতি পতি ও কবি চম্পতি অভিন্ন। চম্পতি পতি—৩৯৪, ৫৭৩।

২। কংসনারায়ণ—৪৭৯ (নেপালের পুথি)।

৩। নৃপসিংহ—৯৪। সম্ভবত সিংহ ভূপতি ও নৃপসিংহ অভিন্ন। সিংহ ভূপতি—১৭৫, ৩৭৮, ৫০৯ (তালপত্র), ৫৯১, ৭৩০, ৮১৫।

৪। পঞ্চানন—৭৮৩।

৫। বল্লভ—৮৯, ৯০, ১৩৬, ১৭৭, ১৯৪, ২৫৭, ২৮৪, ৫৯০।

৬। ভানু—৩২২ (নেপালের পুথি)।

৭। ভূপতি—৩৮০, ৫৩৬, ৭৫৮, ৭৬১। সম্ভবতঃ ভূপতি ও ভূপতিনাথ অভিন্ন। ভূপতিনাথ—৩৭৫, ৪১৯।

৮। রুদ্রধর—৫০১ (নেপালের পুথি)।

৯। লক্ষ্মীনাথ—১৬৩ (নেপালের পুথি)। সম্ভবত লক্ষ্মীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণ এক। লক্ষ্মীনারায়ণ—৮২৯।

১০। দশ অবধান—৫২৯ পৃষ্ঠা। মিথিলার ঐতিহ্য যে, দশ অবধান বিদ্যাপতির উপাধি। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি ?

১১। বিদ্যাপতি ও দাস গোবিন্দের মিশ্রিত ভণিতায় ৮৬, ২১০, ৫৩৮, ৫৯৬, ৬৬৯। এইগুলি সন্দেহজনক।

১২। বিদ্যাপতি ও রাধামোহনের মিশ্রিত ভণিতায়—৬১৫। এটি সন্দেহজনক।

এই সমস্ত বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট ৩২টি। এগুলিও বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে বর্জ্জনীয়।

৬। আমরা এক্ষণে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদগুলির আলোচনা করিব। পূর্ব্বে রাগতরঙ্গিণীর সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে, কতকগুলি অবিদ্যাপতির পদ বিদ্যাপতির নামে চালান হইয়াছে। এ স্থলে আমরা বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের আলোচনা করিব।

৯ নং—পদকল্পতরু ৮৩ সংখ্যায় বিদ্যাপতির ভণিতা আছে বটে, কিন্তু গীতচিন্তামণিতে বিদ্যাবল্লভ পাঠ দেখা যায়।

৪৪ নং—পদটি বিখ্যাত। কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা—

নসীর সাহ ভানে
মুখে হানল নয়ন বানে
চীরৈ জীব রহু পঞ্চ গৌড়েসর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিসংরক্ষক সম্প্রতি পরলোকগত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে আমরা পাইতেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮নং পুথিতে ভণিতা—

সাহা হুসেন জানে
জাকে হানল বদন বানে
চিরজীবী রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।

P 36229

৮সুধীরচন্দ্র রায় এবং শ্রীঅপর্ণা দেবীর সম্পাদিত কীর্ত্তনপদাবলীর ভণিতা—

ঈসত হাসনি সনে
মুখে—হানল নয়ন বানে
চীরজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
শ্রীকবি রঞ্জন ভনে।

মূলে অবশ্য নসীরা সাহ কিংবা সাহা হুসেনের নাম ছিল। বিদ্যাপতি সুলতান হুসয়ন শাহ কিম্বা নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহের সময় বিদ্যমান ছিলেন না। সুতরাং এই পদটি কবিরঞ্জনেরই বটে। তাঁহার অন্যতর উপাধি বিদ্যাপতি ছিল। ইনি বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বা ছোট বিদ্যাপতি।

১৩২ নং—পদকল্পলতিকায় কবিশেখর পাঠ আছে। এই পদের টীকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন, "যেখানে যেখানে কবিশেখর আছে, সেই সেই পদে প্রাচীন অথবা আধুনিক সংগ্রহকারগণ পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতি করিয়া দিয়াছেন।"

১৬৮ নং—ভণিতার পাঠান্তরে কবিরঞ্জন আছে।

৩৬৬ নং—ইহা উমাপতির পারিজাতহরণ নাটকে আছে। সেখানে ভণিতা—

সুমতি উমাপতি সকল নৃপতি পতি
হিন্দু পতি রস জানে।

৪৬০ নং—ইহার ভণিতার পাঠান্তর—

কহ কবি রঞ্জন শুন বরনারি
প্রেম অমিয় রসে জুবুধ মুরারি।

৪৬৪ নং—সম্পাদক বলেন, "এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে।"

৬২৪ নং—পদকল্পলতিকায় ভণিতা—

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দ দাস শুণ গাথা।

৭১৪ নং—বিখ্যাত পদ। কীর্ত্তনানন্দের পাঠই সঙ্গত—

ভনই সেখর কইসে নিরবহ
সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

৮৩৪ নং—বিখ্যাত পদ। পদকল্পতরুর (৯৩৭ নং) ভণিতায় কবিবল্লভের নাম আছে।

শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের অধিক কাল বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আলোচনা করিয়া আমার সিদ্ধান্ত এই যে, যে সমস্ত পদে রাধাকে রাজকন্যা, তাঁহার পিতার নাম বৃকভানু, মাতার নাম কীর্ত্তিদা, তাঁহার সখীগণের নাম, যথা—ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি, তাঁহার শাশুড়ী ননদের নাম জটিলা কুটিলা এবং কৃষ্ণের সখাদের নাম সুবল সুদাম ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের কিংবা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ নহে। ২২ ও ৫৩৪নং পদে জটিলা আছে এবং ২০৮ ও ২০৯ নং পদে সুবল আছে।

পূর্ব্বোক্ত পদগুলিতে বিদ্যাপতির নাম প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। অন্তত তাহাদের অকৃত্রিমতা সন্দেহজনক। এই জন্য এই ১৪টি পদ বর্জ্জনীয়।

চ। অনবধানতাবশতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে বিদ্যাপতির ৪৯২, ৭৪৭ এবং ৭৬৯ নং তিনটি পদ যথাক্রমে ৬৪০, ৭৬৪ এবং ৭৮৪ নং পুনরুক্ত হইয়াছে। গুপ্তের ১৫৮ নং

বিদ্যাপতির বাঙ্গালা দেশের পদ, ইহার মৈথিল পাঠ তালপত্রের পুথি হইতে ১৫৯নং দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই ৪ জোড়া পাঠের মধ্যে ৪টি পদ বাদ যাইবে।

ছ। অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন (Journal of the Department of letters, Calcutta University, vol xvi, p. 23 ff)।

গুপ্তের ১৪৭ নং—নন্দীপতির
„ ৩৬৯ নং—রুদ্রনাথের
„ ২৮০ নং—চন্দ্রনাথের
„ ৬৮৬ নং—ধৈরজপতির
„ ৬৯৬ নং—উমাপতির
„ ২৭২ নং—হরিপতির।

সুতরাং এই ছয়টি পদও বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-সংস্করণে বিদ্যাপতির মোট ৯৩৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে বাদ দিতে হইবে—

(ক)	১৩
(খ)	৫৪
(গ)	১৩৩ ৫৬
(ঘ)	৩৯
(ঙ)	১৪
(চ)	৪
(ছ)	৬
	৩১৯

অবশিষ্ট ৬১৬টি পদ আমরা বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে স্থান দিতে পারি। ভবিষ্যতে গবেষণা দ্বারা হয় ত ইহা হইতে কিছু বাদ দিতে হইবে। এই ৬১৬টি পদের সহিত আমরা মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বিদ্যাপতির কতকগুলি খাঁটি পদ যোগ করিতে পারি। এই পুস্তকে ৮৬টি সম্পূর্ণ এবং ৫টি খণ্ডিত পদ আছে। এই ৯১টি পদের মধ্যে ২টি অমৃত করের, ৬০টি বিদ্যাপতির এবং অবশিষ্টগুলি ভণিতাবিহীন। এই ৬০টির মধ্যে ১৫টি গুপ্তের সংস্করণে আছে। সুতরাং ৪৫টি নূতন পদ পাওয়া যাইতে পারে। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত) বিদ্যাপতির ৩২টি নূতন পদ আছে। তন্মধ্যে ৬টি কবিশেখর, কবিরঞ্জন ও শেখরের ভণিতায়। অবশিষ্ট ২৬টি পদ বিদ্যাপতির। ইহাতে বর্ত্তমানে বিদ্যাপতির পদসংখ্যা হইবে ৬৮৭। ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বিদ্যাপতির নূতন পদ পাওয়া যাইতে পারে।

জ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বিদ্যাপতির পদের পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গলার বৈষ্ণব পদসংগ্রহে যে সমস্ত বিদ্যাপতির

পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের ভাষায় অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে। মিথিলার প্রাচীন পদসংগ্রহ পুস্তকের সাহায্যে এই সকল পদের পাঠ শুদ্ধ করিতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) পদকল্পতরুর ৮৫৫ নং পদের পাঠ—

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হও বরনারি॥
নাহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ।
মালতি মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কঙল কুল না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এ হেন সু ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

গুপ্ত মহাশয়ের ৬৯ নং পদটি তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত। তাহার সহিত নিম্নে উদ্ধৃত রাগতরঙ্গিণীর (৭০ পৃঃ) পদ মিলাইলে খাঁটি পদটি কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারা যায়।—

কত ন বেদন মোহি দেহে মদনা,
হর নহি বালা মোরে জুবতি জনা॥
নহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী,
সিরে সুরসরি নহিঁ কুসুমক সেনী॥
চাঁদ তিলক মোহি নহি ইন্দু-ছোটা,
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥
কণ্ঠ গরল নহি, মৃগমদ চারু,
ফনিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু॥
ভণই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা,
এক দোস অছ ওহি নামক বামা॥

রাগতরঙ্গিণীতে তালপত্রের পুথির একটি শ্লোক নাই—

বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেণু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বস্থন॥

কিন্তু পদকল্পতরুর পাঠের সহিত তুলনা করিলে এই শ্লোকটি যে মূলে ছিল, তাহা প্রমাণিত হয়। তালপত্রের নবম চরণে আছে—

নহি মোরা কালকূট মৃগমদ চারু।

কিন্তু পদকল্পতরুতে আছে—

কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, রাগতরঙ্গিণীর ধৃত পাঠই ঠিক—

কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।

(২) আর একটি উদাহরণ দিই। পদকল্পতরুর ২০৭ নং পদে আছে—

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবান॥
চিকুরে গলয়ে জলধার।
মুখ শশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুলে আসি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতি নারি রসিক জন পাওয়ে॥

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তালপত্রের পুথির পাঠ ৩৭ নং পদে দিয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীতে (৭৩ পৃঃ) ভণিতাবিহীন ভাবে এই পদ নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

কামিনি করএ সনানে,
হেরত হিঁ হৃদএ হন পঁচ বাণে।
চিকুর গরএ জলধারা,
মুখসসি তরেঁ জনি রোঅএ অধারা॥
তিতল বসন তনু লাগূ,
মুনিহুঁক মানস মনমথ জাগূ॥
কুচযুগ চারু চকেবা,
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥
তেঁ সঙ্কা-ঞে ভুজ পাসে
বান্ধি ধরিঅ উড়ি জাএত অকাশে॥

গুপ্তের উদ্ধৃত পদে "তিতল বসন" ইত্যাদি শ্লোকটি "বাঁধি ধএল" ইত্যাদি চরণের পরে আছে। কিন্তু বাঙ্গলা ও রাগতরঙ্গিণীর পাঠ হইতে তাহা যে "মুখসসি" ইত্যাদি চরণের পরে হইবে, তাহা নিশ্চিত বোঝা যায়। পদের অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্যের দিক্ দিয়াও ইহা সঙ্গত। তুলনা দ্বারা আমরা আরও স্থির করিতে পারি যে, রাগতরঙ্গিণীর "মুখসসি তরেঁ"

স্থলে "মুখ সসি ভরে" পাঠই শুদ্ধ। বাঙ্গলা পাঠে পদকল্পতরুর "বান্ধি ধরল" ইত্যাদি স্থলে পদরসসারে "বান্ধি ধরল জনী উড়য়ে আকাশে" আছে। তরাসে স্থলে আকাশে পাঠ মূল অনুযায়ী। মৈথিলীতে জনু—যেন না, জনি=যেন। অনেক স্থলে বাঙ্গলার পদে জনু ও জনির ভুল প্রয়োগ দেখা যায়। আমরা আরও দেখিতেছি যে, যদিও রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত পদের পরে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" আছে, কিন্তু ভণিতা নাই। তালপত্রের পুথির ভণিতা যে ঠিক, তাহা পদকল্পতরু ও তালপত্রের পাঠ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

(৩) যেখানে বিদ্যাপতির একাধিক পদ মিথিলার পুথিতে পাওয়া যায়, সেখানে তুলনা করিয়া উৎকৃষ্টতর বা বিশুদ্ধতর পাঠ নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গুপ্তের ভণিতাবিহীন ৯২ পদের পাঠ, যাহা নেপালের পুথি হইতে উদ্ধৃত এবং মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীর নিম্নে উদ্ধৃত ৩৫নং পাঠ তুলনা করুন।

তে অতি নাগর তঞে রস সার,
পসরও বীথী পেম পসার।
জৌবন নগর বেসাহত রূপ
ততে মুলই হহ জতে সরূপ। ধ্রু।
সাজনি সে হরি রস-বনিজার,
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার।
বিধি বসে অবে করব নহি মান,
জইঅও সোলহ সহস পতি কাহ্ন।
তহ্নি তোহঁ উচিত বহুত জে ভেদ,
মনমথ মথথে করব পরিছেদ।
ভনই বিদ্যাপতি এহ রস জান,
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিরমান।

প্রথম চরণে "রসসার" (নেপালের সব-সার স্থলে) শুদ্ধ। দ্বিতীয় চরণে বীথী পাঠ (নেপালের মল্লী স্থলে) শুদ্ধ। তৃতীয়ে "বেসাহত" (আরবী বিধাএত, বাং বেসাত, নেপালের 'বেসাহব' স্থলে) শুদ্ধ। চতুর্থে "মুলই হহ" (নেপালের "মুল হোইহ" স্থলে) শুদ্ধ।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন—

"যৌবন নগরে রূপ বিক্রয় করিবে,
যাহা যথার্থ সেই মূল্য হইবে।"

আমাদের ধৃত পাঠে অর্থ হইবে—"যৌবন নগরে রূপই বেসাত, তুমি সেই দাম চাহিবে, যাহা যথার্থ।" আমরা মৈথিলী পদে ভণিতা পাইতেছি, যাহা নেপালের পুথিতে নাই।

ঝ। বিদ্যাপতির খাঁটি পদ উদ্ধার করিতে হইলে মধ্য যুগের মৈথিলী ভাষা ও ব্যাকরণ জানা দরকার। গুপ্ত মহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমো ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গঃ" হয়। আমি উদাহরণস্বরূপে নিম্নে কয়েকটি বিচ্যুতি দেখাইতেছি।

৭৫ নং—　　দসমি দসা পথ অঁগির ঞো
ন কর ঞো তেসর কানে।

গুপ্তের অনুবাদ—"দশমী দশার পথ অঙ্গীকার করিবে, (তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে তুলিবে না।" ব্যাকরণ অনুসারে -অঞো (-অঙ) উত্তম পুরুষের এক বচনের বিভক্তি। সুতরাং অনুবাদ হওয়া উচিত—"(বরং) দশমী দশার পথ অঙ্গীকার করিব (করি), (তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে তুলিব (করি) না।"

১৮০ নং এই পদটি রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ১০৯) হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু গুপ্তের প্রতিলিপির ভুলে অর্থেরও ভুল হইয়াছে। মূলে আছে—

অছল জোর সিরীফল ভাঁতি।
কএলহ ছোলঙ্গ নারঙ্গ কাঁতি॥
ভনই বিদ্যাপতি ন কর লাথ।
ভুখল ন খাহু দুহু হাথ॥

গুপ্তের অনুবাদ—"(পয়োধর) শ্রীফলযুগলের তুল্য ছিল, ছাড়ান নারঙ্গ (ফলের) ন্যায় করিয়াছ। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ছলনা করিও না, নাগরের দুই হস্তের নখসমূহ ক্ষুধিত (ছিল)।" তিনি "ভাঁভি, ছোলঙ্গ, কাঁতি, ন খাই" স্থানে পড়িয়াছেন "ভাতি, ছোল, কাতি, নখা।"

প্রকৃত অনুবাদ হইবে—"(পয়োধর) শ্রীফলযুগলের তুল্য ছিল, (তাহাতে) ছোলঙ্গ ও নারঙ্গ (ফলের) কান্তি করিয়াছ। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ছলনা করিও না, ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুই হাত দিয়া খাইও না।" এই শেষ বাক্যের সহিত তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ। (৪৭ পৃঃ)

১৯৬ নং—বিনু হুত বহে ভেল বারহবান।

গুপ্তের অনুবাদ—"বিনা অগ্নিতে মহামূল্য হইল।" তিনি বারহবানের অর্থ করিয়াছেন "বারো-গুণ মূল্য, অর্থাৎ মহামূল্য।" কিন্তু ইহার অর্থ খাঁটি সোনা। এই অর্থে দশবানও ব্যবহৃত হয়।

২২৫ নং—বহি রতিরঙ্গ লিখাপন মানে। গুপ্তের অনুবাদ—"মানাবস্থায় রুদ্ধ গৃহের বাহির হইতে অনুনয়, রতিরঙ্গ ও মান (কৃষ্ণের) অনুভবজ্ঞাপক (কাহিনী)।" তিনি বহির অর্থ করিয়াছেন "বহির্গতি, রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে মানিনীকে অনুনয়।" বিদ্যাপতি নিজেই এই চরণটির সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন—বহির্ণতিরতিক্রীড়া মনোবেদনলেখকঃ। কিন্তু ইহাতে লিপিকরপ্রমাদ আছে। শুদ্ধ পাঠ হইবে—বহির্ণতি-রতিক্রীড়া-মান-বেদন-লেখকঃ। অর্থাৎ বহি (পুস্তক) নতি, রতিক্রীড়া, মান, বেদন লেখক। রামকৃষ্ণ শর্ম্মা বেণীপুরী এই পদের বহি শব্দের অর্থ হিন্দীতে করিয়াছেন—"বহি—বহী হিসাব কী পুস্তক।" সুতরাং উদ্ধৃত পংক্তির প্রকৃত অর্থ হইবে—পুস্তক (হইতেছে) রতিরঙ্গ ও মান লেখক।

২৮৭ নং— জগত নাগরী মুখে জিনলা হে
গেলা হে গগন হারি।

গুপ্তের অর্থ—"জগতে (সকল) নাগরীর মুখ জয় করিয়াছিস, (তাহাদিগকে) হারাইয়া গগনে গিয়াছিস।" কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—ওহে, জগতে নাগরীরা (তোমাকে) (তাহাদের অকলঙ্ক) মুখ দ্বারা পরাজিত করিয়াছে। ওহে, তুমি হারিয়া গগনে গেলে। বেণীপুরীও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

২৮৯ নং—সাএ সাএ কমন বেদন তহু জানে।

গুপ্ত "সাএ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন শত। কিন্তু পদাবলীতে বহু স্থানে আক্ষেপসূচক অব্যয় "সাএ সাএ" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,

সাএ সাএ কহহ কহহ কাহ্ন (৫০০ নং)
সাএ সাএ হমর পরান নাথ কওঁনে বিরমাওল (৭৩৬ নং)

এই সকল স্থানে "সাএ সাএ" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "সই, সই"।

২৯৪ নং—ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরসে চিহ্নিঅ ভুমি দিগমগ উপজ সন্দেহ।

গুপ্তের অর্থ—"এক স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকি, সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া (চিত্ত) দোলায়মান হয়।" ইহার প্রকৃত অর্থ—(এক) স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া রহি, স্পর্শের দ্বারা ভূমি চিনি। দিক্ ও পথ (সম্বন্ধে) সন্দেহ উৎপন্ন হয়। বেণীপুরীও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

৪০৮ নং— নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে গাস হল আচর ফেলী॥

গুপ্তের অর্থ—"নবীন অবস্থায় নারঙ্গী ছোলঙ্গীর (তুল্য পয়োধর) কাম অঞ্চল ফেলিয়া (আবৃত করিয়া) সাজাইল।" তিনি "কোরি কি বেলী"র অর্থ করিয়াছেন "নবীন সময়ে।" সম্বন্ধ পদে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধীয় পদের পূর্ব্বে "কী" হিন্দী ভাষায় আছে; মৈথিলীতে "ক" হয়। সুতরাং নবীনতার বেলায় বা নবীন অবস্থায়, এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ—(কৈশোরে পয়োধর) নারঙ্গী, ছোলঙ্গী, কুল কিংবা বেল (সদৃশ ছিল)। কাম আঁচল ফেলিয়া (আবৃত করিয়া) তাহা সাজাইয়াছিল। "কোরী" কুল অর্থে অন্যত্র পদে ব্যবহার আছে—কুচ কোরী ফল নখ খত রেহ (১৮৫ নং)।

৪৮২নং— কত মহি অহি দেহে দমসল
চরণে তিমির ঘোর।

গুপ্তের অর্থ—"দেহ দ্বারা ধরাতলে কত সর্প দলিত করিলাম, চরণে ঘোর তিমির।" ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে—ধরাতলে কত সর্প দেহ দংশন করিল, চরণে ঘোর তিমির।

৬২৬নং— শূন সেজ হিয় শালয় রে
পিয়ারে বিন্থ ঘর মোয়ে আজি।

বিনতি করউ সহি লোলিনিরে
মোহি দেহ অগি হর সাজি ॥

গুপ্তের অর্থ—"আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সখি, মিনতি করিতেছি, অগ্নি সাজাইয়া আমার দেহ হরণ (দাহ) কর।"

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৫ পৃ.) এই পদ আছে। তাহাতে শুদ্ধরূপে পদটি লিখিত হইয়াছে—

সূন সেজ হিঅ সাল এ রে
পিয়াঞে বিনু মরব মোঞে আজি।
বিনতি করঞো সহি লোলিনি রে
মোহি দেহে অগি হর সাজি।

ইহাতে প্রকৃত অর্থ হইবে—শূন্য শয্যা হৃদয় শল্যবৎ বিদ্ধ করে। প্রিয় বিনা আমি আজ মরিব। প্রিয় সখি রে, মিনতি করি, আমার জন্য অগ্নিগৃহ (চিতা) সাজাইয়া দাও।

৬৫১নং—　পাতহি সঞো ফুল ভমরে অগোরল
তরুতর লেলহি বাসে।
সে ফল কাটি কীটে উপভোগল
ভমরা ভেল উদাসে।

গুপ্তের অনুবাদ—"ফুল হইতেই ভ্রমর আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল ; সে ফল কাটিয়া কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল।" তিনি "পাতহি" অর্থ করিয়াছেন "পড়িতেই," কিন্তু "পাতহি সঞো" ইহার অর্থ হইবে "পত্র হইতেই"। তৃতীয় পংক্তিতে "ফল" ভ্রান্ত পাঠ, শুদ্ধ ফুল হইবে। তাহাতে প্রকৃত অর্থ হইবে—পত্র (উদ্‌গম) হইতেই ভ্রমর ফুল আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল। সে ফুল কাটিয়া ইত্যাদি।

৬৬৬নং—　আব ভেল ঝাল কুসুম সব ছুছ
বারি বিহুন সবকেও নহি পুছ।

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৯ পৃঃ) এই পদ আছে। সেখানে শুদ্ধ পাঠ আছে "সরকেও" (সবকেও স্থলে)। গুপ্ত মহাশয় "ঝাল" ও "ছুছ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে কটু বা গন্ধশূন্য এবং অস্পৃশ্য। তিনি শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন—"এখন কুসুম গন্ধশূন্য ও সকলের অস্পৃশ্য হইল। বারি বিহনে (শুষ্ক কুসুমকে) কেহই জিজ্ঞাসা করে না।" কিন্তু "ঝাল" ও "ছুছ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "নিদাঘ" এবং "শূন্য"। "কুসুম সবে ছুছ" স্থানে বেণিপুরী (১৯৮ পৃ.) "কুসুম রস ছুছ" পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে এই চরণটির অর্থ "এখন কুসুম কটু (গন্ধহীন) ও রসহীন হইল।" কিন্তু "কুসুম সবে" স্থলে সম্ভবতঃ "কুসুমসরে" পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হইবে—এখন নিদাঘ (উপস্থিত) হইল,

সরোবর কুসুমশূন্য হইল। বারি বিহনে কেহ সরোবরকে জিজ্ঞাসা করে না। বাল সংস্কৃত ঝল্লিকা বা ঝলা শব্দজাত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝালিআ।

৬৮১নং— নারি পরখি নেহ বঢ়াবয়
সুনহ পুরুখ থোরা।

ইহা কীর্ত্তনানন্দ হইতে উদ্ধৃত। ইহার অর্থ গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন—"নারী পরোক্ষেও স্নেহ বাড়ায়, শুনিতে পাই, পুরুষের (স্নেহ) অল্প।" কীর্ত্তনানন্দ আমার কাছে নাই। কিন্তু মনে হয়, শুদ্ধ পাঠ এইরূপ ছিল—

নারি পুরুখে নেহ বড়াবয়
সিনেহ পুরুখ থোরা।

ইহার অনুবাদ হইবে—নারী পুরুষের প্রতি প্রেম বাড়ায়। পুরুষের প্রেম অল্পই।

৭৩৬নং— বিসম কুসুম সর ভাবে।

গুপ্তের অর্থ—"কুসুমশরের ভাব বিষম।" কিন্তু "ভাবে" ইহার অর্থ "বোধ হয়"। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—"আন পানী মোকে একো না ভাএ" (৩৪৯ পৃ.)। ইহাতে অর্থ হইবে—কুসুমশর বিষম বলিয়া বোধ হয়।

৭৪৮ নং—কোমল অরুণ কমল কুম্ভিলায়ল। গুপ্ত "কুম্ভিলায়ল" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়াছে," কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে "ম্লান হইয়াছে," হিন্দীতে "কুম্হলানা" ক্রিয়া পদের অর্থ ম্লান হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া।

৭৫৪ নং—অরে অরে অরে কাহ্ন কি রহসি বোরি। গুপ্তের অর্থ—"ওরে ওরে ওরে কানাই, কি কৌতুকে ডুবিয়া আছিস," "ডুবিয়া" অর্থ হইলে "বুরি" পাঠ হইত। বেণীপুরী "বোরি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বোলি," রলয়োরভেদঃ এই সূত্রানুযায়ী। তাঁহার মতে শুদ্ধ পাঠ হইবে—অরে অরে অরে কাহ্ন কী রভসে বোরি। ইহার অর্থ—ওরে ওরে ওরে কানাই, কি রহস্য করিয়া বলিতেছ? (ক্যা রভস কর বোল রহে হো)। তুং—'তুহু সখি রভসে মোহে জনি বোলবি লোক করব পতিয়ারা' (৩২০ নং)।

৮০০ নং—বৈসলি ভমরী হর উদ্‌গারএ। গুপ্ত ইহার কোন অর্থ দিতে পারেন নাই। কিন্তু বেণীপুরী (১৩২ পৃঃ) ইহার পাঠ এইরূপে শুদ্ধ করিয়াছেন,—

বৈসলি ভমরী হরউদ গাবন।

তিনি "হরউদ"-এর অর্থ করিয়াছেন—"পলনে কা গীত" অর্থাৎ দোলনার গীত।

ঞ। গায়কদের মুখে ও লিপিকরপ্রমাদে বিদ্যাপতির পদে অনেক অশুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের পদসংগ্রহে ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে। এই জন্য মিথিলার প্রাচীন পুথির সহিত বাঙ্গলা দেশের পদ মিলাইয়া বিদ্যাপতির খাঁটি পদ যত দূর সম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। একটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) মল্লার রাগ।

মলিন চকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল মোয় ॥
কোই কমল-দলে করই বতাস।
কোই চতুর ধনি হেরই নিশাস ॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনি চেতন ভেল নাম তোহারি ॥*
উরে দোলে শামর বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিনি বেদন সখি সমুঝাওয়ে ॥　(পদকল্পতরু, ১৯৪৩ পৃ)

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী।
তুয় গুনে লুবুধি মুগুধি ভেলী রাহী ॥
উর পর সামরি বেণী।
কমল কোষ জনি কারি নাগিনী ॥
কেও সখি তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে ॥
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরি ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সমঝাবে ॥
(নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তালপত্রের পুথি, ৭৫৭ নং)

ধনছী গীত

মলিন কুসুম তনু চীরে,
করপর বদন নয়ন চরু নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী,
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধি ভেলী রাহী ॥

---

* পাঠান্তর। চমকি উঠল শুনি নাম তোহারি।

উরঁ লুর সামরি বেণী,
কমল কোষ জনি কারি নাগিনী ॥
কেঅও সখি তাকএ সাঁসে,
কেঅও নলিনীদলেঁ করএ বতাসে ॥
কেঅও বোল আএল হরী,
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী ॥
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে,
বিরহিনি বেদন সখি সমঝাবে ॥ (রাগতরঙ্গিণী, ১০৩-৪ পৃঃ)

এই তিনটি পাঠ তুলনা করিয়া এবং ছন্দ লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত বিশুদ্ধ পদ সম্পাদন করিতে পারা যায়—

মলিন কুসুমতনু চীরে।
করতর বয়ন নয়ন ঢরু নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী।
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধি ভেলি রাহী ॥
উরঁ লুর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি কারি নাগিনী ॥
কেঅও সখি তাকএ সাঁসে।
কেঅও নলিনী দলেঁ করএ বতাসে ॥
কেঅও বোল আএল হরী।
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহিনি বেদন সখি সমঝাবে ॥

এই পদে "লুর" শব্দটি অনেকের নিকট দুর্বোধ্য। ইহা "লুলএ" শব্দের মৈথিল রূপ, অর্থ "দোলে"।

(২) মিথিলার প্রাচীন পুথির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ব্যবহৃত নেপালের পুথি ও তালপত্রের পুথি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ দেখা যায়, সেখানে অন্য পুথির সাহায্য অপরিহার্য্য। নিম্নে একটি উদাহরণ দিতেছি।

অধরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ গুনইছিঅ চাঁদক চোরি ॥
ঘরে ঘরে পহরী গেল অছ জোহি।
অবহী দুখন লাগত তোহি ॥
কতএ লুকাএব চাঁদক চোর।
জতহি লুকাওব ততহি উজোর ॥

হাস সুধারসে ন কর উজোর।
বনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর॥
অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিন্দুরক সীম বেসাউলি মোতি॥
ভণই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কা থী ভেদ কলঙ্ক॥—(গুপ্তের ২২৮ নং, তালপত্রের পুথি)
লোলুঅ বদন সিরি ধনি তোরি।
জনু লাগিহ তোহি চাঁদক চোরি॥
দরসি হলহ জনু হেরহ কাহু।
চাঁদ ভরমে মুখ গরসত রাহু॥
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার।
তীখ তরল তঁহি কটাখ ধার॥
নিরবি নিহারি ফাসগুন জোলি।
বাঁধি লেত তোহি খঞ্জন বোলি॥
সাগর সার চোরাওল চন্দ।
তা লাগি রাহু বরএ বড় দন্দ॥
ভণই বিদ্যাপতি হোউ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ কিছু লাগু কলঙ্ক॥
(গুপ্তের ২২৯, নেপালের পুথি ও মিথিলার পদ)
আঁচরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনৈছিঅ চাঁদক চোরি॥
ঘরেঁ ঘরেঁ পৈঁ হরি গেলহ জোহি।
একনে দূষণ লাগত তোহি॥
বাহর সুতহ হেরহ জনু কাহু।
চাঁন ভরমে মুখ গরাসত রাহু॥
নিরভি নিহারি ফাঁসগুন তোলি।
বাহি হলত তোঁহেঁ খঞ্জন বোলি॥
ভনহি বিদ্যাপতি দোহু নিশঙ্ক।
চান্দ হুঁ কাঁ কিছু লাগু কলঙ্ক॥—(রাগতরঙ্গিণী, ৫৬ পৃঃ)
আঁচরে বদন ঝাঁপায়হ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি ছোড়ি গেল জোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরি তোয়॥

হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণিক ধনি ধনি বোলবি মোরি॥
অধর সমীপ দশন কর জোতি।
সিন্দুর সমিপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয়ে জনি বিপদকলেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কিত তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহ বিশঙ্ক॥—(পদকল্পতরু, ১৮৬১ পদ)

এই চারিটি পদপাঠ হইতে আমরা একটি আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করিতে পারি।—

আঁচরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি গেল অছ জোহি।
অবহী দুখন লাগত তোহি॥
দরসি হুলহ জন্থ হেরত কাহু।
চাঁদ ভরুমে মুখ গরাসত রাহু॥
হাস সুধারসে না কর উজোর।
ধনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর॥

অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিঁদুরক সীম বেসাউলি মোতি॥
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার।
তীখ ভরল তহিঁ কটাখ ধার॥
নিরবি নিহারি ফাঁসওন জোলি।
বান্ধি হলত তোহি খঞ্জন বোলি॥
ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁথী ভেদ কলঙ্ক॥

(৩) যেখানে তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথির মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ দেখা যায়, সেখানে আদর্শ পাঠ অন্য পুথির সাহায্যেও প্রস্তুত করা অনেক সময় অসম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা গুপ্তের ৫৮নং পদটি লইতে পারি। ইহাতে গুরুতর পাঠভেদের সহিত ভণিতারও ভেদ আছে। তালপত্রের পুথির ভণিতা—

ভন বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
ও নহি ও রস জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবী রমান॥

নেপালি পুথির ভণিতা—

ভনে বিদ্যাপতি জে জন নাগর
তা পর রভলি নারী।
হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ নরপতি
পরসন হোথু মুরারি॥

তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগের ইতিহাস অতি বিচিত্র ও কৌতুককর। মনে হয়, যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে এই প্রয়োগের ধারা অল্পবিস্তর নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যাপক আলোচনা হয় নাই।

অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই বেদের মন্ত্র এমন সব কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাদের সহিত মন্ত্রের অর্থগত প্রত্যক্ষ কোন যোগ নাই।[১] পরবর্তী যুগে এ রীতির অনুসরণে অবৈদিক কার্যেও বেদের মন্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেবপূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ দেবপূজা এবং বিশেষ করিয়া পূজিত দেবতার মধ্যে অনেকের কোন উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতার পূজায় প্রত্যেকতঃ স্বতন্ত্র মন্ত্র বা সূক্ত[২] ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অধিবাস, ঘটস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গেও বেদের মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রের সহিত দেবতা বা অনুষ্ঠানের যোগ অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন বিষয়ে ধ্বনিসাম্য মাত্র। 'কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে' (ঋগ্বেদ. ১।৬।৩) এই সূর্যমন্ত্রটি কেতুপূজায় ব্যবহৃত হইবার কারণ বোধ হয় ইহার মধ্যের কেতু শব্দ, যদিও ইহার সহিত নবগ্রহের অন্তর্গত কেতুর কোনও যোগ নাই। 'শং নো দেবীরভীষ্টয়ে' (ঋ. ১০।৯।৪) জলদেবতার এই মন্ত্রটি শনির হোমে ব্যবহৃত হয়। ইহা নাকি কোন সময়ে শনির অভিষেকে প্রযুক্ত হইত। 'শং নো'র সহিত শনির ধ্বনিসাদৃশ্য অবশ্য লক্ষণীয়। 'সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসঃ' (ঋ° ৪।৫৮।৭) এবং 'দধিক্রাব্ণো অকারিষং' (ঋ° ৪।৩৯।৬) এই মন্ত্র দুইটি যথাক্রমে সিন্দুর ও দধি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও ঐ দুই দ্রব্যের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তবে 'সিন্ধোরিব' ও সিন্দুরের ধ্বনির অনেকটা মিল আছে—'দধিক্রাব্ণো' পদের দধির সঙ্গে আমাদের পরিচিত পরম উপাদেয় দধির ধ্বনিসাদৃশ্য ছাড়া আর কোন যোগ নাই।

অবৈদিক কার্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা কৌতুককর নিদর্শন তন্ত্রের পঞ্চ মকার শোধনে ইহাদের ব্যবহার। ব্রহ্মানন্দের তারারহস্য (ষোড়শ শতাব্দী), পূর্ণানন্দের

১। ওলডেনবার্গ, গৃহ্যসূত্রস্, সেক্রেড বুক্স্ অব্ দি ঈস্ট, ৩০, পৃ. ১১৪ পাদটীকা; ব্লুমফিল্ড, হিম্নস্ অব দি অথর্ববেদ, সেক্রেড বুক্স্ অব দি ঈস্ট, ৪২, পৃ. ৪৮০; ভাণ্ডারকার, সার্চ ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস্ (১৮৮৩-৪), পৃ. ৩৭; উইন্টারনিট্স্, হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান্ লিটারেচর, ১ খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

২। বাংলা দেশে মন্ত্র অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা, সংকল্পসূক্ত, লক্ষ্মীর সূক্ত, নারায়ণের সূক্ত প্রভৃতি।

শ্যামারহস্য (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)[৩] এবং প্রাণ-কৃষ্ণ রামতোষণের প্রাণতোষিণী (উনবিংশ শতাব্দী) প্রভৃতি বাংলা দেশের বিভিন্ন তান্ত্রিক নিবন্ধে এই বিষয়ে বিধিব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রমাণরূপে বিভিন্ন গ্রন্থে স্বতন্ত্র তন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র ও উত্তরতন্ত্রের নাম ও বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন দ্রব্যের শোধন প্রসঙ্গে যে যে মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রার সহিত এই সব মন্ত্রের অর্থগত দূরতম সম্পর্কও আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে।

প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ (ঋগ্বেদ ১। ১৫৪। ২)	মাংসশোধন
ত্র্যম্বকং যজামহে (ঋ° ৭। ৫৯। ১২)	মৎস্যশোধন
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং (ঋ° ১। ২২। ২০)	মুদ্রাশোধন
তদ্ বিপ্রাসো বিপণ্যবো (ঋ° ১। ২২। ২১)	মুদ্রাশোধন[৪]
হংসঃ শুচি সদ্ বসুরন্তরীক্ষং (ঋ° ৪। ৪০। ৫)	মদ্যশোধন[৫]
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (ঋ° ১০। ১৮৪। ১)	শক্তিশোধন[৬]
গর্ভং ধেহি সিনীবালি (ঋ° ১০। ১৮৪। ২)	

পরশুরামকল্পসূত্রেও উপরিনির্দিষ্ট সাতটি মন্ত্রই তান্ত্রিক পূজায় মদ্যবিশিষ্ট বিশেষার্ঘ্যদান প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আর্দ্রং জ্বলতি' (তৈঃ আঃ ১০। ১। ১৫) মন্ত্রটি এই উপলক্ষ্যে মদ্যপান সম্পর্কে বিহিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুথিতে সম্পৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীসূক্তের (ঋ° ১। ১৬৫) তান্ত্রিক প্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্র সহযোগে লক্ষ্মীপূজার ও বিভিন্ন ন্যাসের অনুষ্ঠানের বিধানও ইহাদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

এগুলি ছাড়া অন্য কোন বৈদিক মন্ত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানি না। তবে বৈদিক সংস্কার ও হোম তন্ত্রমতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে—কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র তান্ত্রিক কর্মে কিছু কিছু পরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী প্রসিদ্ধ

৩। বহুপরিচিত এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় (শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ও ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃঃ ৩৮২, ৫০৬, পি. কে. গোড়ে, জার্নাল, গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ১।১৭৭, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৪।৭৪)।

৪। শ্যামারহস্য ও প্রাণতোষিণীর মতে দুইটি মন্ত্রই মুদ্রাশোধনে প্রযোজ্য—তারারহস্যের মতে দ্বিতীয় মন্ত্রটি মদ্যশোধনে ব্যবহার্য। বস্তুতঃ তারারহস্যে পঞ্চমকার শোধন প্রসঙ্গে এই একটি মন্ত্রই উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। এই মন্ত্রটি উত্তরতন্ত্রের প্রমাণবলে কেবলমাত্র প্রাণতোষিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। মাংসাদিদ্রব্য শোধনমন্ত্রের পরে এই মন্ত্র দুইটী শ্যামারহস্য ও প্রাণতোষিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—কিন্তু ইহাদের প্রয়োগস্থল উল্লিখিত হয় নাই। মৈথুন বা শক্তির শোধনেই ইহাদের ব্যবহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। গর্ভাধান সংস্কারে ইহাদের ব্যবহারের স্পষ্ট নির্দেশ প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হয়[৭]—ইহাদের মধ্যে বৈদিক গায়ত্রীর কয়েকটি শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক স্বস্তিবাচনের একটি তান্ত্রিক রূপও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কালীপূজায় ব্যবহৃত তান্ত্রিক স্বস্তিবাচনের মন্ত্রটি এইরূপ :

ক্রীঁ হুঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণা হুঁ
স্বস্তি নঃ কালী মেধামৃতময়ী।
হ্রৌঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু ॥

ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক স্বস্তিবাচনের মন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

৭। ভৈরবীর গায়ত্রী—'ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ' তুলনীয়।

'গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—সেখ ফয়জুল্লা নহেন

শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ এম-এ, বি-টি, সাহিত্যভারতী

বিগত ১৩২৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়' পুস্তকের সম্পাদকীয় ভূমিকার অন্তর্গত কয়েকটি অংশ অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করায় যথার্থ যুক্তির সাহায্যে ঐ ঐ অংশের অযৌক্তিকতা নির্ণয়পূর্ব্বক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজে উহার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'গোরক্ষবিজয়ে' যোগিগুরু মীননাথের পতন ও তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার পুনরুদ্ধারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা নাথধর্ম্মের একখানি প্রধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহা হইতে বাঙ্গালীর তৎকালীন সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। 'গোরক্ষবিজয়' সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য-আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—

গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপরূপ গ্রন্থ যে বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগে রচিত হইয়েছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র; তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, গোরক্ষবিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দ্দেশক চিহ্ন।...যে চরিত্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা বঙ্গীয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। যেমন অশোকস্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথধর্ম্মের একটি গৌরবজনক নিদর্শন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

যোগী পুরুষদিগের যে কায়াসাধনা ("Kayasadhana is the most important thing in the Natha Literature and Kayasiddhi or the perfection of body may be taken to be the summum bonum after which the jogins were aspiring."—Obscure religious cults as background of Bengali Literature by Dr. S. B. Dasgupta, M.A., P. 256. তাহাও এই গ্রন্থে পরম নৈপুণ্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ কি সাহিত্যের দিক্ দিয়া, কি বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের দিক্ দিয়া, কি নাথধর্ম্মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক্ দিয়া এই গ্রন্থখানি অতীব মূল্যবান্। এরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে—স্থিরভাবে তাহার সিদ্ধান্ত হওয়া অত্যন্ত উচিত।

এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা লইয়া এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। গোরক্ষ-বিজয়ের সম্পাদক মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার ভূমিকায়

দেখাইয়াছেন যে, সেখ ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়ে'র প্রকৃত রচয়িতা। সম্পাদক মহাশয় 'গোরক্ষবিজয়ে'র যে ভণিতাগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন, সেগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—গ্রন্থখানি কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন—এই কবিচতুষ্টয়েরই রচিত; কিন্তু চারি জন কবি মিলিত হইয়া এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; এবং নানারূপ প্রমাণ-সহকারে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই চারি জন কখনও সমসাময়িক ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে ভীমদাস বা শ্যামদাস সেনও যে গ্রন্থখানির প্রকৃত রচয়িতা হইতে পারেন না—সে সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমিও একমত। এখন প্রশ্ন হইতেছে—কবীন্দ্র ও সেখ ফয়জুল্লা—এই দুই জনের মধ্যে কে এই গ্রন্থের প্রণেতা?

এই প্রশ্নের উত্তরে মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় নানারূপ মনগড়া অগ্রহণীয় ও অবান্তর যুক্তির অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেখ ফয়জুল্লাই গোরক্ষ-বিজয়ের প্রকৃত রচয়িতা।

এ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—

ফয়জুল্লাকে আমরা গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন পুস্তকের আদিলেখক বলিয়া মাল্যচন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু "আদিলেখক" অর্থে আমরা শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই। যেরূপ শীতান্তে বকুলগাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সুতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া দেয়; সেইরূপ গোরক্ষবিজয় ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য-সাহিত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয় ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬০ পৃষ্ঠা।

রচয়িতা নির্ণয় সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন বলেন,—

সম্ভবতঃ শ্যামদাস ফয়জুল্লা ভীমদাস ইত্যাদি গায়ক ছিলেন মাত্র, মূল রচয়িতা হয় ত আর কেহ হইবেন।—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সংস্করণ), ৯৬৯ পৃষ্ঠা।

আমার মনে হয়, মদীয় শিক্ষাগুরু ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতই গোরক্ষবিজয়ের প্রকৃত ও মূল রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—এই অভ্রান্ত সত্যের কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে প্রকৃত মূল রচয়িতা কবীন্দ্র দাস কি না, সে সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র সন্দেহ আছে। কিন্তু দ্বিধার কোনই হেতু নাই—সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই; কারণ, যখন আমরা পড়ি—

(১) কহেন কবিন্দ্র দাস সুন নরগণ।
সিধার (সিদ্ধার) সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ॥
কবিন্দ্রবচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥—গোরক্ষবিজয়, ১৩০ পৃষ্ঠা।

(২) গোর্খের বিজয়কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥—গোরক্ষবিজয়, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

তখন কবীন্দ্র দাসই যে গোরক্ষবিজয়ের মূল রচয়িতা ও ফয়জুল্লা উহার শুধু নামমাত্র সঙ্কলয়িতা, সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

'কবিন্দ্র বচন সুনি'—অর্থাৎ কবীন্দ্র দাসের রচিত গোরক্ষবিজয়ের বচন শ্রবণ করিয়া ফয়জুল্লা জনগণসাধারণ্যে গুরু মীননাথের চরিত্র বুঝাইয়া দিলেন, ইহা ত উপরি উক্ত ভণিতা হইতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। তবুও সকলের ক্ষীণতম সন্দেহ দূরীকরণার্থ আরও কতকগুলি যুক্তি প্রমাণ সুধী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ—

ওঁ হরি। নমো গণেশায় নমঃ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

গোরক্ষবিজয় হিন্দু কবির ব্যবহৃত এই বাক্যাবলীর দ্বারাই আরম্ভ করা হইয়াছে; কিন্তু মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, জানি না—কোন্ অদ্ভুত যুক্তিবলে বলিয়াছেন যে—ইহা নকলনবীশগণের দ্বারাই লিখিত হইয়াছে। আমি মনে করি—ইহা তাঁহার মনগড়া কল্পনা বই আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ তাহা যদি না হইত—এই হরিবন্দনা যদি কোন হিন্দু কবিকৃত না হইয়া, শুধু মাত্র নকলনবীশেরই কার্য্য হইত, তবে উহার পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ-অনুমোদিত "স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল" ত্রিভুবনস্রষ্টা ঈশ্বর-বন্দনা, সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা, হর-গৌরীর বিবাহ প্রভৃতি কিরূপে গোরক্ষবিজয়ের প্রথমে স্থান পাইল, তাহা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠা যায় না। গোরক্ষবিজয়ের প্রথমে হিন্দুর দেবাদিদেব মহাদেব ও তৎপত্নীর যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ অনুপম বর্ণনা কোন ইসলামীয় সাহিত্যে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষবিজয়ে হিন্দু যোগশাস্ত্রের যে সমস্ত গূঢ় কথা আলোচিত হইয়াছে, উহা যদিও প্রাচীন বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, তবুও উহা হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গোরক্ষবিজয়োক্ত যোগশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক বর্ণনা দেওয়া একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু কবির পক্ষেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্ভব।

তৃতীয়তঃ গোরক্ষবিজয়ে যে কয়েকটি অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত আরবী-ফারসী শব্দ আছে, তাহা বাদ্‌শাহী আমলের মুসলমানী ভাষাপ্রাধান্যের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ভাবিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইতে হয় যে, সেই মুসলমানী আমলে এইরূপ একখানি খাঁটি হিন্দুভাবাপন্ন কাব্য কিরূপে রচিত হইয়াছিল। কবীন্দ্র দাসের মূল রচনায় হয় ত এই কয়েকটি মুসলমানী শব্দও ছিল না, কিন্তু সেখ ফয়জুল্লার সঙ্কলনে এই বিদেশী শব্দের আমদানী সম্ভবপর হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন ঠিকই বলিয়াছেন—"যে পুথি বা পুথিগুলি অবলম্বনে পুস্তকটি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার রচনায় বা সংস্কারে ফয়জুল্লার হাত ছিল বলিয়া মনে হয়।"—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, ৯৬৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থতঃ 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের ভিতর একটু অভিনিবেশ সহকারে তলাইয়া দেখিলে অতি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যেই বুঝা যাইবে যে, ইহা হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসেরই লেখা। প্রার্থিত বর লাভ করিবার আশায় কুমারী কন্যার শিবপূজাপ্রথা এখনও যেমন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত আছে, গোরক্ষবিজয় রচনার সময়ও উহা প্রবর্ত্তিত ছিল এবং তাহার উল্লেখ হিন্দু কবি স্পষ্টই করিয়াছেন :—

গর্ব্বত্তর রাজসুতা বিরহিণী নাম।
স্বামী হেতু শিব পুজে মাগে মনস্কাম ॥—গোরক্ষবিজয়, ৩৪ পৃঃ।

গুরু মীননাথকে কদলীরাণীদের "ভোল" বা মোহ হইতে বাঁচাইবার জন্য গোরক্ষনাথের প্রথমে যমপুরীতে গমনও হিন্দু কবির হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভুবন।
তথাতে দেখিলুম গিয়া তাহার লিখন ॥
তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ।
নিবারে যমের দুতে করিছে আদেশ ॥—গোরক্ষবিজয়,পৃঃ ৪২।

এবং

গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে।
জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥
একে একে জথ কাগজ চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়া ॥
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
কাগজ চাহিয়া লেখা পাইল তখন ॥
লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ।
আর না করিয় যম এমন সাহস ॥—গোরক্ষবিজয়, ৪৭-৪৮ পৃঃ।

এইরূপ যমরাজের খাতায় পাওয়া মীননাথের অবশিষ্ট আয়ু তিন দিন কাটিয়া দিয়া, তাঁহার আয়ু বাড়াইয়া দেওয়ার কাহিনী—"যমপুরী ও নচিকেতা"র কাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ হিন্দু পুরাণোক্ত উপাখ্যানে বিশ্বাস (belief in Hindu Mythology) একমাত্র হিন্দু কবির পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পঞ্চমতঃ গোরক্ষবিজয়ে বর্ণিত অসংখ্য হিন্দু উপাখ্যান হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসের পক্ষেই জানা ও কাব্যে ঢুকাইয়া দেওয়া স্বাভাবিক। স্বীকার করি, ফয়জুল্লার পক্ষেও তাহা জানা অস্বাভাবিক নয়; কারণ, আমরা বৈষ্ণবভাবাপন্ন অনেক মুসলমান কবিদেরও সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, কিন্তু এই গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোনওরূপ মুসলমানী উপাখ্যান বর্ণিত নাই। যদি সেখ ফয়জুল্লাই ইহার প্রকৃত রচয়িতা হইতেন, তবে তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মীয় উপাখ্যান একেবারে বাদ দিয়া, সম্পূর্ণই হিন্দু পুরাণোক্ত কাহিনীর উপর নির্ভর করিবেন কেন? গ্রন্থের ভিতর যত উপমা, তাহাও অধিকাংশ হিন্দুভাবাপন্ন। যথা—

মুখপদ্ম সম তোহ্মার পূর্ণিমার শশী।
মোর রূপে জিনিতে পারি স্বর্গের উর্ব্বসি॥
মোর রূপে জিনিতে পারি ইন্দ্র সুরেশ্বরী।
লিলাএ জিনিতে পারি গঙ্গা আর গৌরী॥—গোরক্ষবিজয়, ১৬৬ পৃঃ।

গ্রন্থোক্ত সমস্ত দেবতারাই হিন্দুর দেবতা। যথা—

হরি হর আদি করি দেবতা সকল।— ঐ, ১৬৬ পৃঃ।
রাধা কানু বঞ্চিল এহি ক্ষিতিতলে॥
দেবের দেবতা হেন তাহা জানি।
সেহ রতি ভুঞ্জিল লইয়া রমণী॥
... ...
দেবতা গন্ধর্ব্ব য়াদি তার সেবইতি।
... ...
সিদ্ধ বিদ্যাধর জথ য়াছে চরাচর।— ঐ, ১৬৮ পৃঃ।
হরগৌরি চলি যাও পৃথিবীর মাজ।— ঐ, ৯ পৃঃ।
আজ গুরু মহাদেব পাছে আর সব।
সাধন্ত সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব॥
মহাদেব চলি গেল পর্ব্বত কৈলাস।
তথা গিয়া মহাদেবে করে গৃহবাস॥— ঐ, ১৪ পৃঃ।
চল যাই তোহ্মি আহ্মি ব্রহ্মার সদন।— ঐ, ৪৬ পৃঃ।
মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরি দুই নারী থাকে নিরন্তর॥
য়ার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি কুতুহল॥— ঐ, ১১১ পৃঃ।
ভাবসিদ্ধি বলি মীনে বলে রাম রাম॥
হাসিয়া বলিলা মীনে নাম মহানাম।— ঐ, ১৮৯ পৃঃ।
উড়িয়া পরম হংস জায় ব্রহ্মপুর॥— ঐ, ১৯৪ পৃঃ।
শিব শক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে।— ঐ, ১৯৫ পৃঃ।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর বিশেষ কেহই বাদ পড়েন নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, পৃথিবীর আদি গুরু হইতেছেন দেব-আদি-দেব মহাদেব। সত্যই যদি এই কাব্য সেখ ফয়জুল্লা কর্ত্তৃক লিখিত হইত, তবে তাঁহার স্বধর্ম্মীয় আল্লাহ-আকবর থাকিতে হিন্দুর মহাদেবকে পৃথিবীর আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহার সতর্ক বিবেক কি তাঁহার লেখনীকে আঘাত করিত না? এ কথা ভাবিয়া দেখিবার পরেও যিনি গোরক্ষবিজয় সেখ ফয়জুল্লা কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বুঝিতে হইবে—তিনি গোড়া হইতেই যেন এইরূপ পক্ষপাতগ্রস্ত

মত জাহির করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু যে সত্য দ্বিপ্রহরের দিবাকরের ন্যায় প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর, তাহাকে আর কত ক্ষণ অসত্য অন্ধকারের কুক্ষিতে ঢাকিয়া রাখা যাইবে? বস্তুতঃ আজ প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের স্বর্ণযুগে যাহা খুসী প্রচারিত মত চালাইয়া দিবার সুযোগ মিলিবে না। আজ আমরা প্রত্যেকটি মতই সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের দ্বারা যাচাই করিয়া লইব। যে মত সত্যের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। গোরক্ষবিজয়ের প্রকৃত রচয়িতা যে কবীন্দ্র দাস—এ সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—তবুও "অধিকন্তু ন দোষায়" মনে করিয়া বিজ্ঞ সুধী জনের জ্ঞাতার্থে নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করিতেছি। যথাঃ—

রামের জানকী ছিল অনঙ্গের রতি।
কৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী॥
চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের জে নারী।
রাবণের মন্দোদরী শিবের গঙ্গা গৌরী॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারী শাস্ত্রেত যে দেখি।
পৃথিবীত কেবা আছে এ সব উপেখি॥—গোঃ বিজয়, ১৬৯ পৃঃ।

ইহা ত পরিষ্কারই হিন্দু কবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। যদি কোন মুসলমান কবির রচিত হইত, তবে এতগুলি হিন্দু নারীর পার্শ্বে এবং শুধু তাই নয়, এই সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে একটিও ইসলামী বিবির নামোল্লেখ না থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে? ইস্‌লামী সাহিত্যে আমরা ত অনেক বিবিকে সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু ফয়জুল্লার কাব্যে আমরা তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্যও দেখিতে পারিলাম না কেন?

সপ্তমতঃ, গোরক্ষবিজয়ে নিষিদ্ধ সঙ্গম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ জোর দেওয়া হইয়াছে—

অমাবস্যা পালিয় সংক্রান্তি পালিষ
ডানে পাশে না শোয়াইয় নারী॥
নারীর নিশ্বাসে শরীর শুখাইব রে
দিনে দিনে জাইব পাতুরালী॥—গোঃ বিঃ, ১৮৬ পৃঃ।

এবং

রবি শশী অমাবস্যা এ তিথি পূর্ণিমা।
প্রতিপদ নবমী না জাইয় নারীসীমা॥
জতনে মাসান্ত পাল দশমীরে।
বাধিনী শোয়াসে আউ জায় ধীরে ধীরে॥
বৎসরেতে বার মাস তাতে একদিন।
তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখে চিন॥
সন্ধ্যা পালিয় জাম বামেতে পবন।
মন বন্দি করিয়া জে রাখহ জীবন॥

কদাচিত নিজ চন্দ্র না করিবা ব্যয়।
বার বৎসরের আয়ু একদিনে ক্ষয়॥—গো: বি:, ১৮৮ পৃ:।

এইরূপ উপদেশ ত সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ—

ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবস্যামুত্তে পক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াম্॥

দারোপগমন সম্বন্ধে উপরি উদ্ধৃত রচনা একমাত্র সংস্কৃত কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দু কবির পক্ষেই লেখা স্বাভাবিক। যদি এ গ্রন্থখানি সেখ ফয়জুল্লার রচিত হইত, তবে তাঁহার স্বধর্ম্মীয় ঐস্লামিক বিধি কি তাঁহার লেখনীকে প্রভাবান্বিত করিত না?

ইসলামে শুধু ঋতুস্নানে তিন দিন, প্রসবের পর চল্লিশ দিন এবং রোজার সময়ে দিবসে মাত্র সহবাস নিষিদ্ধ।—যৌনবিজ্ঞান, আবুল হাসান, ১ম সংস্করণ, ৪০১ পৃ:।

কোরানের এই উদার উক্তি শাস্ত্রবিৎ ফয়জুল্লার পক্ষে জানা অতি স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও তাঁহার কাব্যে উদার কোরানোক্তি স্থান পাইল না,—স্থান পাইল বিধর্ম্মীদের শাস্ত্রানুশাসন! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা—এই মতের স্বপক্ষে বলা যায় যে, এখানে মুসলমান কবি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু আজি হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার অন্ধতামস যুগে—যখন স্বধর্ম্মে দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস ও পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের চরমতম ও পরমতম বৈশিষ্ট্য, তখনকার সেই অসভ্য বর্ব্বরোচিত ধর্ম্মান্ধতার দিনে মুসলমান কবি ফয়জুল্লার পক্ষে 'কাফের' হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধিকে তদীয় কাব্যে প্রচারিত করা সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। অতএব এই কাব্যরচনা কোন মুসলমান কবির পক্ষে অসম্ভব এবং হিন্দু কবির পক্ষেই সম্পূর্ণ ন্যায়োচিত স্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

বস্তুতঃ এই 'গোরক্ষবিজয়' হিন্দু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের পটভূমিকায় হিন্দু আদর্শোদ্‌বোধিত একখানি কাব্য। ত্যাগবাদী হিন্দুর যে সনাতন আদর্শ—আত্মার মুক্তি (salvation of the soul)—তাহাই এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"The story of the fall of Mina-nath among the women of Kadali signifies that worldly enjoyment in the form of the satisfaction of carnal desires leads a man to disease and decay; and death in that case becomes the inevitable catastrophe of the drama of life. The self-oblivion of Mina-nath symbolises man's oblivion of his true immortal nature; and the charms of Kadali represents the snares of life. What was repeatedly emphasised by Gorakh in his enigmatic songs in the guise of the dancing girl to recall his self-forgotten Guru to his true judgment is that the life of pleasure in company of beautiful women leads to the inevitable end of death, while the only way of escaping death and being immortal even in this very life and body is to have recourse to the path of Yoga." Obscure relegious Cults as background of Bengali Literature, Dr. S. B. Dasgupta, page 255.

ইস্‌লামীয় ভোগবাদ এ কাব্যে স্থান পায় নাই। ইহাতে হিন্দুর চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শই জীবন্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কদলীরাজ্যের ষোল শত নারীর আপাতমধুর মোহ হইতে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার, ভোগ হইতে ত্যাগের ব্রত গ্রহণের ও দেহ হইতে আত্মার মুক্তি-সাধনার রূপক বলিয়া ধরিলে, বোধ হয়, এই কাব্যখানির প্রতি সাহিত্যিক অবিচার করা হইবে না। কিন্তু দৈহিক কামনাবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মার মুক্তি-সাধনায় সোনার ফসল ফলানোর স্বপ্নই ত অধ্যাত্মবাদী হিন্দুর চিরন্তন আত্মিক আদর্শ। এই মধুরতম আধ্যাত্মিক স্বপ্নকে কাব্যে বাস্তব রূপ দেওয়া জন্মান্তরের সংস্কার-অর্জ্জিত আজন্ম-হিন্দুভাববাদী কবির পক্ষেই একমাত্র স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। কারণ, কাব্য জীবনদর্শন। ("Poetry is the criticism of life"—Mathew Arnold.) অতএব আমরা যে দিক্ দিয়াই এই কাব্যের রচয়িতা সম্বন্ধে বিচার করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু কবির রচিত বলিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এবং এই হিন্দু কবি যে কবীন্দ্র দাস ভিন্ন আর কেহই নহেন, তাহা তাঁহার বিভিন্ন ভণিতাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব কবীন্দ্র দাসই গোরক্ষবিজয়ের অবিসংবাদিত মূলরচয়িতা বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন।

———

অশ্বান

বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ।
কিন্তু বলবীর্যহীন অসুস্থের
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিষ্ফল

নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে
শরীর সুস্থ সবল রাখা শক্ত।

অশ্বানের নিয়মিত
সেবনে দৈনন্দিন
ক্ষয় পূর্ণ হইয়া দেহ
মন তেজোদৃপ্ত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৯ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

১।	ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৪৭
২।	বাংলা ভাষায় পালি শব্দ ও ইডিয়ম্—শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরী	...	৫৪
৩।	পঞ্চম বেদসার নির্ণয়—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	...	৬৮
৪।	ব্যাকরণের পুরুষ—শ্রীননীগোপাল দাশ শর্ম্মা	...	৭৩
৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ	...	৭৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড :

(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ১০৲ + ১২৷৷০

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙ্গালী-জীবন
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) ৫৲

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র : ১ম-২য় ভাগ ৫৲ + ২৷৷০

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্ত্তমান
শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫৲

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল স্মরণীয়
সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা
করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

নূতন প্রকাশিত হইল

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য সাড়ে বারো টাকা

* * *

সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র

উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা
আট খণ্ডে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ৬০৲

মধুসূদন

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা
রেক্সিনে বাঁধানো ১০৲ কাগজের মলাট ৮৲

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্য দুই খণ্ডে
সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান
মূল্য ১০৲

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে
মূল্য ৪৭৲

পাঁচকড়ি

অধুনা-দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্ব্বাচিত
সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৲

শরৎকুমারী

'শুভবিবাহ' ও অন্যান্য
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৷৷০

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী। রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য ১৬৷৷০

সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস

ব ঙ্গী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

CALCUTTA UNIVERSITY

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৫৯

ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাব্যরচনায় হেতু নির্দ্দেশ করিয়া প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট 'কাব্যপ্রকাশে' একটি কারিকা লিখিয়াছেন :—

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে॥

এই ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে কবিত্বের বীজস্বরূপ জন্মগত স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে কেহই কবি হইতে পারে না। মহাকবি ভারতচন্দ্রে এই ভগবদ্দত্ত কবিত্বশক্তি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন করিলে তাহা সদ্যই প্রতিভাত হয়। কোন্ অজ্ঞাত কাব্যজ্ঞের হস্তে কাব্যরচনায় ভারতচন্দ্রের প্রথম হাতেখড়ি হইয়াছিল, অধুনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পড়িয়া তিনি যে আত্যন্তিক অভিনিবেশ সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কোন্ কোন্ শাস্ত্র তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী॥ (অন্নদামঙ্গলের শেষে, পৃ. ৩৯৭)

এ স্থলে একটি তথ্যের উপর কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই—অন্নদামঙ্গল রচনাকালে (১৬৭৪ শক = ১৭৫৩ খ্রীঃ) ভারতচন্দ্রের পূর্ণ অভ্যুদয় এবং তৎকালে তিনি "অধ্যাপক" ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রীতিমত চতুষ্পাঠী করিয়া ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনাও কিছুকাল করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের পৌত্রের নিকট জানিয়া তাঁহার পঠদ্দশার অতি মূল্যবান্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য 'নওয়াপাড়া' নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া, নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুণি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎর্সনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন

করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই ও যজমান নাই যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে'।" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ৪-৫)। এই বিবরণ প্রণিহিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, মণ্ডলঘাট পরগণায় অবস্থিত ভারতচন্দ্রের বাল্যলীলার আবাসস্থল মাতুলগৃহ, শ্বশুরগৃহ ও শ্বশুরগৃহ সম্বন্ধে কোনই গবেষণা হয় নাই। কোনও স্থানীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অদ্যাপি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতচন্দ্র কোন্ সময়ে নিজগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলাশ্রয়ে আসিয়া অধ্যয়ন করেন, তাহা অনুমান করা যায়। ১১১৯ বঙ্গাব্দে দুর্দান্ত বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র (রাজত্বকাল ১১০৯-৪৫ সন), "যাঁহাকে 'তরোয়ার বাহাদুর' বলা যায়" (সংবাদপ্রভাকর, ২৫ আষাঢ়, ১২৫৯ সংখ্যা), ভুরসুট পরগণা আক্রমণ করিয়া দখল করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই আক্রমণের যে জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। আমরা প্রামাণিক বিবরণ অন্যত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৭-৮)। ১১২৫ সনের পূর্ব্বে ভুরসুটে শান্তি স্থাপিত হয় নাই, প্রমাণ আছে। সুতরাং ১১২০-২৪ সনের মধ্যে কোন সময়ে ভারতচন্দ্র পলায়ন করিয়া মাতুলগৃহে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। শিক্ষারম্ভকালে তাঁহার বয়স প্রায় দশ ধরিলে মাতুলগৃহে থাকিয়া তাঁহার অধ্যয়নকাল ৮।১০ বৎসরের কম ছিল না, অনুমান করা যায়। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহার সহোদরগণ তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্যই তিরস্কার করিয়াছিলেন, বিবাহের জন্য নহে। তাঁহার মাতুলাশ্রয়েই বিবাহ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাঁহার শ্বশুরকুল রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র "কেশরকোণি" নামক শ্রোত্রিয়বংশ। নবদ্বীপের রাজবংশও কেশরকোণি শ্রোত্রিয়। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ বলিয়া থাকেন, ভারতচন্দ্র স্বেচ্ছায় "আচার্য্য"- (অর্থাৎ গ্রহবিপ্র) বংশে বিবাহ করিয়া জাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ভ্রাতৃগণের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ "আচার্য্য" উপাধি অদ্যাপি অনেক রাঢ়ী-বারেন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশে বিদ্যমান আছে।

তিরস্কারের ফলে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে আসিয়া পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া জীবনের গতিকে অনেকটা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা হয় ত উৎসাহ পাইলে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রাদি পড়িয়া পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়া যাইতেন এবং বাঙ্গালী জাতি একজন মহাকবিকে হারাইয়া ফেলিতেন। দেবানন্দপুরে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মুন্সীবংশের বিবরণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ যাবৎ সঙ্কলিত হয় নাই। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রিরচিত "বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাসে" (২য় খণ্ড, ১৯৩৫ খ্রীঃ, পৃ. ২১৫-২৩) এবং তদনুযায়ী "হুগলী জেলার ইতিহাসে" (পৃ. ৩১৬-২১) এই বংশের বিবরণ যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা অভ্রান্ত নহে। আমরা সংশোধনপূর্ব্বক একটি প্রামাণিক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুঃখের বিষয়, নবাবী সনন্দ, পারসী পুথি প্রভৃতি বংশের ঐতিহাসিক উপকরণ বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থবংশীয় "কামদেব দত্তচৌধুরী" সর্ব্বপ্রথম দেবানন্দপুরে আগমন করেন। হুগলী কালেক্টরীর ৮০০২৭নং তায়দাদ দৃষ্টে জানা যায়, তিনি অজ্ঞাতনামা নবাবের নিকট

"লাখরাজী পাইয়া গড়বাটী করেন" (ভূমির পরিমাণ ৪/০ বিঘা)। লাখেরাজপ্রাপ্তির তারিখ তায়দাদে লিখিত নাই, বংশের কুরছীনামায় লিখিত আছে "১০০১ হিজরী সনে" (অর্থাৎ ১৫৯২-৩ খ্রীঃ) কামদেব আগমন করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে ; কারণ, ১২০৯ বঙ্গাব্দে কামদেবের অধস্তন "৭ম পুরুষ" দখলকার ছিলেন। কামদেবের দুই পুত্র—দেবীদাস ও কল্যাণপ্রসাদ (ওরফে পরমানন্দ)। এই কল্যাণপ্রসাদের ধারায়ই ভারতচন্দ্রের দুই জন পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহা নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক রচনা সত্যনারায়ণের দুইটি ব্রতকথা হইতে শেষ ভণিতাস্থল উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। কারণ, তৎসম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা চলিতেছে। ত্রিপদী ছন্দের ব্রতকথার শেষ এই :—

দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, **হীরারাম রায়ের** বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়, নায়কেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

(গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৪৩)

চৌপদী ছন্দের কথাশেষ যথা,—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদা ভাবে হতকংস, ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুকুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, **রামচন্দ্র মুনশী**।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি, তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর, হরি হোম্ বরদ্বার, ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

(গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৪৫)

আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম, ভারতচন্দ্রের "নায়ক" হীরারাম রায় তাঁহার এক রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞাতি হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১৮৯)। অধুনা তাহা নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হইতেছে। "ভারত ব্রাহ্মণ কয়" ভণিতা হইতে উক্ত নায়কের ব্রাহ্মণেতর জাতিই সূচিত হয় এবং জানা যায়, মুন্সীবংশেই তৎকালে ঐ নামে একজন ছিলেন। দুইটি ব্রতকথার পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত অনুমানে স্থির করিয়াছিলেন—ত্রিপদীটিই প্রথম রচিত। কারণ, চৌপদীর রচনা "অল্পাংশেই উত্তম"। পক্ষান্তরে আমরা মনে করি, চৌপদীতে নিজের এবং নায়কের যেরূপ সুস্পষ্ট পরিচয় লিখিত হইয়াছে, প্রথম রচনায়ই তাহা সম্ভাবিত হয় এবং ত্রিপদীতে উভয়ের বিন্দুমাত্র পরিচয় না থাকায় বুঝা যায়, তাহার রচনাকালে ঐরূপ পরিচয় প্রদানের আবশ্যকতা ছিল না। সুতরাং তাহা পরে রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। চৌপদী কথাটি স্থলে স্থলে বিলুপ্তাক্ষর ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ একটি মাত্র আদর্শ পুথি হইতে "বহুকষ্টে" সংগৃহীত এবং তজ্জন্য অনেক স্থলে পাঠ সংশয়াকুল রহিয়াছে। নায়কের পরিচয়ে একটি পঙ্‌ক্তির পাঠ—"ভারতে নরেন্দ্র রায়"—নিশ্চিতই ভ্রান্ত। ইহার কোন অর্থই হয় না। সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ হইবে "ভারতনরেন্দ্র-রায়"—

অর্থাৎ যিনি ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক "রায়" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও কষ্টকল্পনা রহিয়া গেল। তবে ইহা সত্য যে, এই সম্ভ্রান্ত দত্তবংশে ঐ সময়ে দুইটি সম্মানসূচক উপাধিই বিদ্যমান ছিল—'রায়' ও 'মুন্‌শী'। বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেন এই বংশের "রামভদ্র রায় মুনশী"কে দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন—দানপত্রের তারিখ ২১ পৌষ ১১৪৮ বঙ্গাব্দ (হুগলী কালেক্টরীর ৩৭০১৩ নং তায়দাদ)। দ্বিতীয়তঃ, চৌপদী ব্রতকথার নায়ক ছিলেন "রামচন্দ্র মুনশী"—ঈশ্বর গুপ্তের সুস্পষ্ট লেখানুসারে ইহাই এত কাল সুবিদিত ছিল। হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত "পারিবারিক ইতিহাসে" লিখিত হইল, ঐ নায়কের নাম "রামরাম মুনশী" (রামচন্দ্র নহে) এবং সম্রাট্ মাহাম্মদ সাহ ১১২৩ হিজরিতে রামরামকে জায়গীরাদি দান করিয়াছিলেন। উক্ত ইতিহাসলেখকের মতে ১১২৩ হিজরি ১১৫১ বঙ্গাব্দের সমান!! এই ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তিই পরে হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃ. ৩১৬-১৮) স্থান লাভ করিয়াছে এবং ভ্রান্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া লিখিত হইয়াছে, রামরাম ছিলেন কল্যাণপ্রসাদের পুত্র (অর্থাৎ কামদেবের পৌত্র)। ঈশ্বর গুপ্ত ভণিতায় যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন ("তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনশী"), তাহা হইতে রামচন্দ্র নামই পাওয়া যায় এবং তাঁহার রূপকস্বরূপ পৌরাণিক রামনাম চৌপদীর প্রথম পদে গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে "রামরামচন্দ্র" একটা নাম হইতে পারে না এবং হইলেও ভাঙ্গিয়া দুই পদে লেখা কবির অক্ষমতা সূচনা করে।

দেবানন্দপুরে বর্ত্তমানে যে নামমালা রক্ষিত আছে, আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়াছি।[১] তদনুসারে কল্যাণপ্রসাদের পুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রঘুনাথ, জয়কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও ঘনশ্যাম চারি জন। জয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ব্বোক্ত রামভদ্র। রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ও রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র হীরারাম। পিতা পুত্র, এই দুই জনই ভারতচন্দ্রের নায়ক ছিলেন সন্দেহ নাই। রাধাকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র (অর্থাৎ রামচন্দ্রের ভ্রাতা) রামেশ্বরের পুত্রের নাম রামরাম। তাঁহার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কথা লিখিত আছে যে, তাঁহার নামান্তর ছিল রামচন্দ্র। ইহা ভ্রমাত্মক, কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না—পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের এক নাম কখনই হইতে পারে না। যে কারণে এই নামান্তর কল্পিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—ঈশ্বর গুপ্তের ভারতজীবনী প্রকাশের পর উক্ত নামমালার অধুনালুপ্ত আদর্শ রচিত হয় এবং তাহাতে রামরামের সম্বন্ধে মূল্যবান্ স্মারকলিপি লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মাহম্মদ সাহ ১১৩৩ হিজরী সনে (অর্থাৎ ১৭২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে "মুনশী" পদবীতে ভূষিত করেন এবং তিনিই ভারতচন্দ্রের নায়ক ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের লেখার সহিত বিরোধ হয় এবং তাহার সমাধানের জন্য রামরামেরই রামচন্দ্র নামান্তর কল্পিত হয়। আমরা অনুমান করি, দিল্লীর সম্রাটের দানভাজন ছিলেন রামচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামরাম নহে। কারণ, রামচন্দ্রের এক পিতৃব্যপুত্র রামভদ্রের রায়-মুনশী উপাধি এবং দানপ্রাপ্তিকাল (১৭৪১ খ্রী)

১। কল্যাণপ্রসাদের বংশধর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ. বি এল্ মহাশয়ের নিকট এই দুর্লভ নামমালা রক্ষিত আছে, আমরা তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল।

তাহাই সূচনা করে। রামভদ্রের পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কিত রামরামের উচ্চ সম্মান ও উপাধিপ্রাপ্তি সম্ভাবিত হয় না। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কল্যাণপ্রসাদের ধারার আরম্ভে এক পুরুষের নাম অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে—যাহা সংশোধন করার কোন উপায় নাই। কামদেবনামীয় তাম্রদাদের সঙ্গে একটি দানপত্রের উল্লেখ আছে—কামদেবের "প্রপৌত্র" হরেকৃষ্ণ ১১৬৯ সনে দেবীদাসের বংশধর (ষড়েশ্বরের পিতা) প্রাণকৃষ্ণকে ভূমি দান করেন। হরেকৃষ্ণ ঘনশ্যামের পুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান নামমালানুসারে কামদেবের "বৃদ্ধপ্রপৌত্র" হইতেছেন। আমরা রামনারায়ণকে রঘুনাথ প্রভৃতির ভ্রাতা ধরিয়া ইহার সংশোধন করিতে চাই।[২] সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে, কামদেবের প্রপৌত্র রামচন্দ্রই ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক ও পারসীশিক্ষক ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের পুত্র হীরারাম ভারতচন্দ্রের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পৃথক্ ব্রতকথা পরে রচনা করেন।

ব্রতকথা দুইটির ভণিতায় "দ্বিজপদে সুমতি" ও "দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত"—এই দুইটি পঙ্‌ক্তি দেখিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে, দেবানন্দপুরেও ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে পূর্ব্বে অনেক চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল—শেষ পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ন্যায়রত্ন প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এখানে অবস্থানকালেই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র "গঙ্গাষ্টক" রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাষ্টকে ছাত্রসুলভ কয়েকটি ব্যাকরণের ভুল লক্ষিত হয় এবং রচনাও উৎকৃষ্ট নহে। তুলনায় নাগাষ্টকের রচনা অত্যুৎকৃষ্ট এবং শ্রান্তিবর্জ্জিত। ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা ২০ বৎসরের কম হইবে না (১১২৪ হইতে ১১৪৪ সন পর্য্যন্ত)—তিনি অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, ইহা অমূলক কথা।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে ভারতচন্দ্রের জন্মসন সম্বন্ধে পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পৌত্রের নিকট জানিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, "রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।" (জীবনবৃত্তান্ত, ১২৬২, পৃ. ৩)। এ বিষয়ে গুপ্তকবি নিঃসংশয় ছিলেন এবং পরেও লিখিয়াছেন, "শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।" (ঐ, পৃ. ৩)। গ্রন্থশেষে গুপ্তকবি যে ভারতচন্দ্রের জীবনপঞ্জীর পুনর্বিচার করিয়াছেন (পৃ. ৫৮-৬০), তাহাতেও ঐ জন্মসন ধরিয়াই গণনা হইয়াছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, গুপ্তকবি তৎস্থলে জন্মসনটিকে অভ্রান্ত ধরিয়া বাধ্য হইয়া একটি কষ্টকল্পনার আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন —"৪০" বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন "এবং সেই বর্ষেই রাজাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল রচনা করেন।" (পৃ. ৬০) আমরা বহু পূর্ব্বেই ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলাম, এই জন্মাব্দনির্ণয় অভ্রান্ত নহে এবং "১৮শ শতাব্দীর

২। বংশের দুইটি ধারায় পুরুষগণনায়ও একটি বিস্ময়কর ভুল ধরা পড়ে, দেবীদাসের ধারায় শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত কামদেব হইতে নবম পুরুষ, কিন্তু তিনি কামদেব হইতে একাদশ পুরুষ শ্রীবিজেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কে খুড়া ঘটেন। প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা এই ভুলও কাটিয়া যায়।

প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫-১০খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।" (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১৯০)। এ বিষয়ে পরে দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা "নাগাষ্টকে" তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া" (দ্বিতীয় শ্লোক)। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, রাজসভায় "৪০ টাকা মাসিক বেতন" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ২১) পাইয়া তিনি কৃষ্ণনগরেই বেশ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং পরে মূলাযোড়ে বাটী করেন। মূলাযোড়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ভূমি দান করেন, ঐ দানপত্রের নকল নদীয়া কালেক্টরীতে আবিষ্কার করিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছি (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৬)—দানপত্রের তারিখ ১ অগ্রহায়ণ ১১৫৬ (১৭৪৯ খ্রী.)। ভূমির পরিচয়স্থলে লিখিত আছে—"পং হাবেলিশহরের মুলাজোড় শং বাস্তু দী ৩২/০" (নদীয়ার ২০৩৩৭ নং তায়দাদ)। সুতরাং বর্দ্ধমানরাজের নায়েব রামদেব নাগের সহিত সঙ্ঘর্ষ ও "নাগাষ্টক" রচনা ১১৫৭ সনের ঘটনা—পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। কারণ, নাগাষ্টক রচনাকালে কবির পিতা জীবিত ছিলেন এবং একটি মাত্র শিশু পুত্র জন্মিয়াছিল (৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আর, ১১৫৯ সনে রচিত অন্নদামঙ্গলের শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিন পুত্রের নামোল্লেখ আছে ("পরীক্ষিৎ তনু ভগবানে")। মূলাজোড়ে বাস স্থাপনের তিন বৎসর পূর্ব্বে ৪০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় আগমন ধরিয়া আমরা ঠিক ১৬২৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১১১৩ সন ও ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম নির্ণয় করিব। কোন কোন লিপিকর ২ ও ৮ সংখ্যার অঙ্ক এমন ভাবে লিখিতেন যে, তাহা ৩ ও ৪ অঙ্কের সদৃশ দেখায়। আমাদের নিকট সৃষ্টিধরাচার্য্যরচিত "ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি" নামক ব্যাকরণগ্রন্থের একাংশের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, ইহাতে ৩ সংখ্যার অঙ্ক প্রায় অবিকল দুইয়ের অঙ্কের মত এবং আটের অঙ্ক অবিকল বর্ত্তমান চারির অঙ্কের মত দেখিতে, কেবল আটের চিরপরিচিত মধ্যস্থ সমরেখাটি অতিরিক্ত। আমাদের এক্ষণে কোন সংশয় নাই যে, এইরূপ কোন লিপিকরের হস্তলিখিত অস্পষ্ট ১৬২৮ অঙ্ক ভুল করিয়া ১৬৩৪ শকাব্দ পড়া হইয়াছিল। ঐ পুথির বিচিত্র পত্রাঙ্ক দেখিলে এইরূপ ভুলের জন্য কাহাকেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না। এই নবনির্ণীত জন্মাব্দের প্রমাণবলে ১১৬৭ সনে মৃত্যুকালে ভারতচন্দ্রের বয়স হয় ৫৪ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ককাল হয় ১৪ বৎসর। তাঁহার "গুণাকর" উপাধি ১৭৪৬-৪৯খ্রী মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত দানপত্রে ঐ উপাধির নির্দ্দেশ আছে। আমরা সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের বিচিত্র জীবনযাত্রার একটি কালসূচি লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

১১১৩	বঙ্গাব্দ—জন্ম (জন্মস্থান পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর)।
১১১৯	কীর্ত্তিচন্দ্রকর্তৃক ভুরসুটরাজ্য অধিকার।
১১২৩-২৪	মাতুলগৃহে পলায়ন।
১১২৪-৪৪	পঠদ্দশা।

১১৪৩	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা (চৌপদী)।
১১৪৪-৫	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা (ত্রিপদী)।
১১৪৫-৪৮	বর্দ্ধমানে মোক্তারী।
১১৪৮	বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত।
১১৪৮-৫২	উড়িষ্যাদি পরিভ্রমণ (৫ বৎসর)।
১১৫২-৫৩	চন্দননগরে।
১১৫৩	কৃষ্ণনগরে।
১১৫৬	মূলাযোড়ে বাটীনির্ম্মাণ।
১১৫৭	নাগাষ্টকরচনা।
১১৫৯ (চৈত্র)	অন্নদামঙ্গলরচনা (১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)।
১১৬৭	মৃত্যু।

বাংলা ভাষায় পালি শব্দ ও ইডিয়ম্

শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ.

বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত, এবং প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে পালি সর্বপ্রাচীন। এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উপর পালি ভাষার শব্দগত প্রভাব বিচার করা হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষারও বাংলা ভাষার উপর অনুরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এখানে, যত দূর সম্ভব, পালি ভাষার নিজস্ব দানটুকু দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পালি ভাষার জ্ঞানের অভাবে অনেক বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত রহিয়াছে। আভিধানিকগণ অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পালি হইতে জানিতে পারিবেন, এবং প্রাকৃত বা পালি মূল শব্দের উল্লেখ অভিধানে দেওয়া থাকিলে সুন্দর হয়।

বাংলা ভাষায় প্রাকৃতের ছাপ যথেষ্ট থাকিলেও বৈয়াকরণগণ সংস্কৃতের দাবিকেই প্রাধান্য দান করিয়া বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তবে প্রাকৃত ভাষাগুলির অধিকতর চর্চার ফলে বাংলা ব্যাকরণের ধারার পরিবর্তন হইবে, আশা করা যায়।

পালি সাহিত্য ভগবান্ বুদ্ধের কথিত ভাষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে ইহাতে অনেক শব্দের কথ্য ও গ্রাম্য রূপ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

* * *

পালি ভাষায় দুই তিনটি স্বর অবিদ্যমান; চলিত বাংলায়, এমন কি, সাহিত্যেও অনেক স্থলে তাহাদের ব্যবহার হয় না, যেমন পশ্চিম-বঙ্গে কেহ "তেল"কে "তৈল" বলে না, "ওষুধ"কে "ঔষধ" বলে না। পালিতে ঋকার ইকারে পরিবর্তিত হয়, যেমন বাংলায়ও হয়, যথা শিয়াল, শিঙ। পালি √পুচ্ছ হইতে বাংলায় "পুছায়" শব্দ আসিয়াছে—এখানে সং "পৃচ্ছতি"র ঋকার উকারে পরিণত হইয়াছে।[১] "ড়" "ঢ়" বৈদিক ভাষায় বর্তমান, কিন্তু সংস্কৃতে অবলুপ্ত; পালিতে কিন্তু বৈদিক ধারা বজায় রহিয়াছে, যেমন "আসাঢ়" (আষাঢ়), "গাঢ়," "বিড়ার" (বিড়াল)। "য়"কার একটি নূতন বর্ণ; ইহা সংস্কৃতে নাই—ইহা য-শ্রুতি, পূর্ণ "য"কার নহে। পদমধ্যস্থিত লুপ্ত বর্ণের স্থানেই সচরাচর ইহার ব্যবহার হয়। তবে কখনও কখনও "য" ও "য়"এর পার্থক্য অগ্রাহ্য করা হইয়া থাকে। পালিতে খাদতি ও খাযতি, সায়তি (√স্বাদ্) প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। বাংলায় বর্গীয় "ব" ও অন্তস্থ "ব" একাকার হইয়া গিয়াছে; উহাদের উচ্চারণের পার্থক্য নাই; অভিধানেও অন্তস্থ "ব"এর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, অথচ "কিম্বা," "এবম্বিধ," "সম্বরণ" ইত্যাদি বানান লিখিলে ছাত্রদের নম্বর কাটা হয়। অন্তস্থ "ব"এর অনাদর বহু প্রাচীন। পালিতে অনেক শব্দে,

১। বাং "উপর"এর গ্রাম্য উচ্চারণ "ওপর"; তুঃ অনুপম<পালি "অনোপম"। এই প্রকার স্বরবিকৃতির দৃষ্টান্ত সকল ভাষায় অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বিসর্গ পালিতে নাই; বাংলায় অনেকে বিসর্গ লিখেন না, যেমন প্রায়শ, সাধারণত, নিশ্বাস ইত্যাদি।

বিশেষত শব্দের আদিতে "ব"এর স্থানে "ব"এর প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন ব্যাধি= ব্যাধি, ব্যাপাদ=ব্যাপাদ, এবং পালি "ব্ব" সর্বত্র "ব্ব" হইয়া থাকে, যদিচ অন্য প্রাকৃতে এরূপ হয় না।

আমরা লিখি সংস্কৃত অনুযায়ী, কিন্তু উচ্চারণ করি প্রাকৃতের ন্যায়—"শিক্ষা"কে বলি "শিক্‌খা," "দিব্যকে" বলি "দিব্‌ব," "দুঃখকে" বলি "দুক্‌খ," "ধর্মকর্ম"কে বলি "ধম্মকম্ম"। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়।"

* * * *

প্রাকৃত শব্দের আদিতে একাক্ষর এবং শব্দমধ্যে তক্ষরিক যুক্ত বর্ণ, ইহাই নিয়ম, ব্যতিক্রম ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। উচ্চারণক্ষেত্রে বাংলা শব্দেরও এই রীতি—√জল=√জল্, স্ব=স, ক্ষমা= খমা; শ্বশুর=শশুর। (পালি "সস্‌সুর"), শ্মশান=শশান (পালি "সুসান"), স্ফোট=ফোড়া (পালি "ফোট"), দ্বীপ=দীপ, জ্যোতি=জোতি (পালি "জুতি"), স্বর্গ=সর্গ (পালি "সগ্‌গ"), স্বামী=সামী; "প্রত্যেক" শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ পত্যেক (পালি "পচ্চেক"); এমন কি, লেখ্য ভাষায় আমরা "খোদিত" (এবং "ক্ষোদিত"), "খুর" (এবং "ক্ষুর"), "খুদ," খালা (স্থাল), খলি (স্থলী) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সকল ক্ষাদি শব্দ এরূপ ভাবে লেখা হয় না। যেগুলি হয় না, তাহা ক্রমে ক্রমে চালাইয়া দিতে হইবে। কতকগুলি চলিবে আর কতকগুলি চলিবে না, এ কিরূপ ব্যবস্থা?[২]

পালি শব্দমধ্যে ত্র্যক্ষরিক যুক্তবর্ণ নাই বলিলেই হয়। বাংলায় শব্দমধ্যস্থিত ত্র্যক্ষরিক বর্ণ আমরা লিখিয়া থাকি, যথা "লক্ষ্মণ," কিন্তু বলি "লক্‌খ্‌ণ"; সেইরূপ তীক্ষ্ণ="তীখ্‌ণ" (পালি তিখিণ), উর্ধ্ব=উর্ধ (পালি উদ্ধ), আকাঙ্ক্ষা=আকাঙ্খা (পালি আকঙ্খা), উজ্জ্বল=উজ্জ্বল, সংখ্যা=সংখা, সন্ধ্যা ইত্যাদি। উচ্চারণ অনুযায়ী বানানসংস্কার কি হইবে না? দ্বিত্ব বর্ণ যেখানে অতিরিক্ত বিবেচিত হইয়াছে, সেই স্থলেই কি কেবল সংস্কারের প্রয়োজন? এই বর্ণদ্বিত্বের আবির্ভাব বহু পুরাতন। পালিতে দেখিতে পাই যে, "য"-ফলা বহু ক্ষেত্রে লিখিত হইত। বানান ত উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া চলে—সং "দেয়"=পালি দেয্য, শ্রেয়ঃ= সেয্য, বৈয়াকরণ=বেয্যাকরণ, পূজনীয়=পূজনেয্য (এবং পূজনীয়) ইত্যাদি। দ্বিত্ব "ব"এর দৃষ্টান্ত দুই একটি মাত্র শব্দে পাওয়া যায়—যৌবন=যোব্‌বন, সীবনী=সিব্‌বনী, অন্ত অক্ষরের মধ্যে—প্রত্যেক=পাটিয়েক্ক (এবং পচ্চেক)—তুঃ প্রাকৃত "এক্ক"। এই দ্বিত্ব উচ্চারণ ও লিখন ব্যবস্থা প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই; সাধারণত অন্তস্থিত ব্যঞ্জনটির লোপ সাধন করিয়া শব্দটি স্বরান্ত করিয়া লওয়া হয়—মনস্, তেজস্, আয়ুস্, ধনুস্ ইত্যাদি শব্দগুলি পালির ন্যায় বাংলাতেও কখনও কখনও স্বরান্ত এবং কখনও কখনও, বিশেষত সমস্ত পদে ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া গৃহীত হয়; যেমন মনস্ শব্দের একবচনে পালিতে মনং ও মনো হয়—সমাসে হয়

২। গ্রাম্য উচ্চারণে আন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অনেক সময়ে লুপ্ত হয়—রামবাবু>আমবাবু—তুঃ পালি ফুল্লক=উল্লক।

মনো-ময়, মনান্তর, যশগান, নভতল ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ বিবেচিত হয়। চক্ষুগোচর, আয়ুষ্কয়, মনমোহন প্রভৃতি বানান চালাইয়া দিলেই হয়[৩] পালি ব্যাকরণ অনুসারে "মনোকষ্ট" পদ অশুদ্ধ নহে; মনোপুব্ব (মনঃপূর্ব), মনোসেট্ঠ (মনঃশ্রেষ্ঠ) প্রভৃতি শুদ্ধ সমস্তপদ; সুতরাং ইতোপূর্বে লিখিলে দোষের হইবে না। বাংলায় আমরা "জগবন্ধু," "জগমোহন" বলি, "জগদ্বন্ধু," "জগন্মোহন" বলি না। আবার কয়েকটি শব্দ পালিতে ও বাংলায় একেবারে স্বরান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, যেমন "কর্ম," সর (সরস্) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে অকার বা আকার যুক্ত করিয়া তাহা স্বরান্ত শব্দে পরিণত করা হয়, যথা—সুহৃদ্ হইতে পালি "সুহদ" শব্দ আগত; তুলনীয় বাংলা "হৃদে," "হৃদ্" শব্দের সপ্তমীর একবচন।

পরবর্তী প্রাকৃতগুলিতে যে যে লক্ষণ পরিস্ফুট, তাহাদের পূর্বাভাস পালিতে দৃষ্ট হয়। স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনের লোপ প্রাকৃতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; কয়েকটি মাত্র পালি শব্দে এরূপ দেখা যায়, যথা, চতুর্দশ—চুদ্দস>বাং "চোদ্দ," বাতুল>বাং "বাউল"। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হইলে সময় সময় দুইটি স্বর প্রাকৃতে পৃথক্ ভাবে পাশাপাশি থাকে, কিন্তু পালিতে তাহাদের সন্ধি হইয়া যায়, যথা স্থবির>থইর (অশোক অনুশাসন)>থের> বাং থুড় থুড়। অধিকাংশ স্থলে লুপ্ত বর্ণের স্থানে "য"শ্রুতির প্রয়োগ হয়, যেমন নিজ>নিয, খাদিত>খায়িত; সেইরূপ বাংলায় শিয়াল, কুয়া, অমিয়। "ন"এর "ণ"এ পরিবর্তন, যেমন "মাণবক," পালি দুই চারিটি শব্দে দেখা যায়—প্রাকৃতে প্রায় নকার "ণ" হয়।

* * *

প্রাকৃত শব্দাবলীর একটি প্রধান লক্ষণ সমীকরণ (assimilation) বাংলা কথ্য ভাষায় বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চলিত বাংলা ভাষা প্রাকৃত শব্দে ভরা—সর্ব>সব্ব>সব, মুদ্গ>মুগ্গ >মুগ, যক্ষ>যক্খ>যক, ভোজ্য>ভোজ্জ>ভোজ ইত্যাদি। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনসন্ধিতে বা প্রত্যয়-যোগে মাত্র সমীকরণের দৃষ্টান্ত মিলে।[৪]

পালি শব্দে স্পর্শবর্ণের প্রথমটি সচরাচর সমীভূত হয়। এইরূপ পরিবর্তনের সহিত প্রায়ই ক্ষতিপূরণ (compensation)এর প্রয়োগ দেখা যায়—সপ্ত>সত্ত>সাত, ভক্ত>ভত্ত>ভাত,[৫] দুগ্ধ>দুদ্ধ>দুধ ইত্যাদি। স্পর্শবর্ণের সহিত অনুনাসিক যুক্ত হইলে পরবর্তী বর্ণের সমীভবন হয়—লগ্ন>লগ্গ>লাগা। ষ্ র্ ল্ ব্ সংযুক্ত বর্ণ প্রায়শ সমীভূত হয়—অগ্র>অগ্গ>আগ, দুর্গ>দুগ্গ>, তুঃ বাংলা উচ্চারণ "দুগ্গা," কৈবর্ত>কেবট্ট>কেবট, শল্য>সল্ল>শাল,[৫] কর্ম> কম্ম>কাম, চর্ম>চম্ম>চাম, পুত্র>পুত্ত>পুত, সূত্র>সুত্ত[৬]>সুতা, অন্বয়>অন্নয়; অভ্যন্তর>

৩। যেমন উদ্+হা=উহা, শরচ্চন্দ্র ইত্যাদি।

৪। সমীভবনের সহিত ক্ষতিপূরণ থাকিলে তাহা পরবর্তী কালের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রাচীন পালি গ্রন্থে এই তথাকথিত পরবর্তী রূপ কয়েকটি শব্দে দৃষ্ট হয়, যথা, দীর্ঘ>দিগ্ঘ>দীঘ (যাহা হইতে পালি "দিগ্ঘিকা" ও বাং "দীঘি" শব্দ), মূল্য>মুল্ল ইত্যাদি।

৫। অভিধানে এই শব্দটির উল্লেখ নাই।

৬। পালিতে যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণ হ্রস্ব হয়।

অত্তস্তর, পক্ক > পালি বানান ও বাংলা উচ্চারণ "পক্ক" > পাকা, বিশ্বাস > বিস্‌সাস, ভদ্র > ভল্ল > ভাল, আর্দ্র > অল্ল—শেষোক্ত দুইটি শব্দে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে—"র"এর পরিবর্তে "দ" সমীভূত হইয়াছে।[৭] সেইরূপ "ক্ষুদ্র" হইতে "খুল্ল"—পালি "চুল্ল" বা "চুল" (শব্দের আদিতে "ক্ষ" "খ" বা "হ্" (চ)কারে পরিণত হয়; নিম্নে দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিতী ব্যুৎপত্তি অনুসারে "খুল্ল" শব্দ √খু ধাতুনিষ্পন্ন। "খুড়া," "কুলি"। যেমন কুলি বেগুন এবং গ্রাম্য "কুল্লে" শব্দ "মাত্র" অর্থে, "খুল্ল" হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। খুল্লতাত শব্দের পালি চুল পিতা। চুণো (-মাছ) শব্দটি "চুল্ল" হইতে উদ্ভূত ধরা যাইতে পারে।

তবর্গের সহিত যকার যুক্ত হইলে তবর্গের বর্ণ চবর্গে পরিণত হয়, এবং যকার সমীভূত হয়—সত্য > সচ্চ > সাচ্চা, মিথ্যা > মিচ্ছা > মিছা, অদ্য > অজ্জ > আজ, মধ্য > মজ্‌ঝ > মাঝ।[৮]

শ, ষ, স যুক্ত বর্ণে সমীভূত হয় এবং অপর বর্ণটি ঘোষস্বরে পরিণত হয়—অক্ষর > অক্‌খর, কাষ্ঠ > কট্‌ঠ > কাঠ, অষ্ট > অট্‌ঠ > আট, বেষ্টন > বেঠন > বেড়া, দংষ্ট্রা > দাঠা > দাঁড়া (অনুনাসিক সংস্কৃত হইতে), ঘুষ্ট > ঘুট্‌ঠ > ঘোঁট, হস্ত > হত্‌থ > হাত, মস্তক > মত্থক > মাথা। "ৎস" "চ্ছ" হয়—মৎস্য > মচ্ছ > মাছ, বৎস > বচ্ছ > বাছা, চিকিৎসা > তিকিচ্ছা > বাংলা গ্রাম্য তিকিচ্ছা, বিচিকিৎসা > বিচিকিচ্ছা > বাং গ্রাম্য বিতিকিচ্ছি, কুৎসিত > কুচ্ছিত, পালি ও বাংলা গ্রাম্য, কুৎসা > বাংলা কুচ্ছো।

কয়েকটি শব্দে "ক্ষ" "চ্ছ"এ পরিণত হয়—খক্ষ > অচ্ছ; সেইরূপ মক্ষী > বাং মাছি। "ছারখার" শব্দের "ছার"এর "ক্ষ" "চ্ছ" এবং "খার"এর "ক" "কৃথ" হইয়াছে।

"স্থ" "ট্‌ঠ" হয়—অস্থি > অট্‌ঠি > আঁঠি।

সমীভবন দ্বারা যেমন কঠিন যুক্তবর্ণ সহজে উচ্চারিত হয়, স্বরভক্তি দ্বারাও সেই উদ্দেশ্য অন্য উপায়ে সাধিত হয়—"রত্ন" "ভগ্নী" পালিতে যথাক্রমে "রতন," "ভগিনী" হয়; বাংলাতেও। শ্রী > সিরী > গ্রাম্য বাংলা ছিরি, হর্ষ > হরিস > বাংলা পদ্যে হরিষ।

বিসমীকরণের (dissimilation) উদাহরণ দুই চারিটি মিলে—ললাট > নলাট; বাংলা পল্লী অঞ্চলেও এই উচ্চারণ। সেইরূপ পালি "নঙ্গল" = বাংলা নাঙ্গল। "চিকিৎসা" শব্দের পালি "তিকিচ্ছা," বাংলা গ্রাম্য উচ্চারণ ঐ।[৯]

৭। বাংলা "এলো" (-চুল) পালি "অল্ল" হইতে আগত হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, ভিজা চুলই ছড়ান থাকে। "অল্লবত্থ" (বস্ত্র), অল্ল কেস (°কেশ); সীসং নহাত্বা অল্ল কেস (মাথা ধুইয়া আর্দ্র কেশ) এই সব পদ দৃষ্ট হয়।

৮। কিন্তু "ন"এর সহিত যুক্ত অনুনাসিক পালির ন্যায় "ঞ্‌ঞ"হয় না—"কন্যা" "কন্যা"ই থাকে, "কঞ্‌ঞা" হয় না। সেইরূপ "জ্ঞ" বাংলাতে পালির ন্যায় "ঞ্‌ঞ"তে পরিণত হয় না—"প্রজ্ঞা" "পঞ্‌ঞা" হয় না। বাংলা "ঞ্ঞ" ক্বচিৎ "ন্ন" হয়—ব্যঞ্জন > গ্রাম্য "ব্যন্নন"—তুঃ পালি "ঞ্ঞ" ও "ক্ষ" দুই একটি শব্দে "ন্ন"এ পরিণত হয়--আজ্ঞা > * অন্না > আণা, পঞ্চদশ > পন্নরস > পনেরো। কথ্য বাংলায় "র্ য" যুক্ত বর্ণের সমীভবন হইয়া থাকে; পালিতে এরূপ স্থলে স্বরভক্তি হয়—যেমন আচার্য = আচরিয়। "হ্ম" বাংলায় "ঞ্‌হ্" হয় না—"প্রশ্ন" "পঞ্‌হ্" হয় না।

৯। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, "পল্লী" শব্দ হইতে "পালি" শব্দের উৎপত্তি সমর্থনযোগ্য।

বর্ণবিপর্যাসেরও দুই একটি উদাহরণ দৃষ্ট হয়—"হ"এর সহিত যুক্ত বর্ণের স্থানপরিবর্ত্তন হয়; বাংলা উচ্চারণও একইরূপ—জিহ্বা>জিব্‌হা, আহ্বান>অব্‌হান; বাংলা উচ্চারণ "ব্‌হ"। যদিও পালিতে ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণ শব্দের বানান সংস্কৃতের ন্যায়, তথাপি মনে হয়, শব্দদ্বয় অনুরূপ শব্দের ("ম্‌হ"এর) ন্যায় উচ্চারিত হইত, যেমন বাংলায়।[১০] সেইরূপ মুহুমান> মুয্‌হমান—বাংলা উচ্চারণ (য=জ) "মুজ্‌ঝমান," গহ্বর>গত্তর—বাংলায় একইরূপ উচ্চারণ।

পালি "গচ্ছি" (√গম্‌ ছ্‌ঙ্‌) স্থানে "গঞ্ছি" রূপ দৃষ্ট হয়। বাংলা রূপকথায় ও ব্যঙ্গে পক্ষি-(পক্‌খি)রাজকে বলে পঙ্খিরাজ; তুলনীয় হিন্দী "পাঙ্খা"; <পক্‌খ<পক্ষ, সেইরূপ ঢক্কা>ডঙ্কা।

"ভ" স্থানে ক্বচিৎ "হ" হয়—প্রভূত>পহুত>বহুত ("বহু"র সহিত সাদৃশ্যবশত উকার হ্রস্বীকৃত হইয়াছে।

শ, ষ, স কখনও কখনও "ছ" হয়—শাবক>ছাপ>ছা, বভ্‌>ছ (পালি ও বাংলা), শ্রী>সিরী>বাংলা গ্রাম্য ছিরি, বিচ্ছিরি, শীর্ণ>বাং "ছিনে"।

পালিতে ক্বচিৎ "ধোবন"কে "ধোপন" বলে; তুলনীয় বাংলা "ধোপা"।

শব্দের অন্তস্থিত 'য'এর লোপ কয়েকটি শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন "অনুপাদায় আসবেহি"=অনুপাদা আসবেহি, "সযম্‌ অভিঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা"="সযমভিঞ্ঞাসচ্ছিকত্বা" ইত্যাদি; বাংলায়ও অনুরূপ বর্ণলোপের দুই একটি উদাহরণ মিলে—আমরা লিখি ব্যবসায়, বলি ব্যবসা।[১১]

* * * *

কতকগুলি দেশী শব্দ পালি ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে, যাহার সন্ধান সংস্কৃতে মিলে না—টঙ্কিকা (টাট); আঢ়া; চাটি (চাটু); পাতি, পাতী—"সরা" অর্থে (পাতিল); পচ্ছি (পেছে, পেতে); মঞ্জুর (গ্রাম্য "মাজুর," সহরে "মাদুর"); পেড়া (ঝাঁপি অর্থে) =পেড়া, পেটে, তুলনীয় পিটক, সং পেট; চঙ্গোটক, চঙ্গোবার (চাঙ্গারি)[১২]; পুটোলি, পোট্টলি, পোট্টলিকা (পুঁটলি), তুলনীয় পুট; পিল্লক—সূকর°—তুঃ (ছেলে)-পিলে, পোলা, কচবর (কাচরা), মঙ্গুস (mongoose, বেঁজি), কুড়—স্তূপ—পংশুকুড় (পাঁশকুড়)।[১৩]

* * * *

১০। পালি "ব্রহ্মা" শব্দের তৃতীয়া "ব্রহ্মুনা"—তুলনীয় বাংলা "বামুন"।

১১। বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আগত, কিন্তু স্থানে স্থানে অর্থবৈষম্য দৃষ্ট হয়। যদিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শব্দের রূপবিচার, তথাপি অর্থানৈক্যের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—"জুগুপ্‌সা" সংস্কৃতে "নিন্দা" অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলা ও পালিতে তৎসম "ঘৃণা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পালি "দক্‌খিণা" শব্দ সচরাচর "দান" অর্থে ব্যবহার হয়; সংস্কৃত ও বাংলায় "দক্ষিণা" অর্থে পুরোহিতের প্রাপ্য বুঝায়। বাংলা ধাত=পালি ধাতু; ইহার একটি অর্থ "আশয়"—"নানা ধাতু"="নানা আসয়"। বাংলায়ও "ধাত" শব্দের ঐরূপ অর্থ হয়।

১২। এই শব্দটির আলোচনা করিয়াছেন Johnson; J R A S. '31 দ্রষ্টব্য।

১৩। সুনীতিবাবুর Origin and development of the Bengali language, ৬৭ পৃ. দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি অসংস্কৃত ধাতু পালি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়— √পুথ্—পোথেতি বা পোঠেতি—প্রহার করা। বাংলা "মেরে পুতে ফেলব" বাক্যে "পুতে" শব্দটি "প্রোথিত" (গর্তে নিহিত করা) অর্থে গৃহীত হয়। কিন্তু মারা ও পোথা একার্থবোধক শব্দ।

√কুট্—কোট্টেতি বা কোট্ঠেতি—ইহার অন্যতম অর্থ প্রহার করা বা মারিয়া ফেলা ("হন্তি")—"বধেন মারপেন বা কোট্টনেন"। "মেরে কুটে ফেলব" বাক্যের অর্থও "খুব প্রহার করিব বা একেবারে মেরে ফেলব"; টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা অর্থ নহে। √কুট ধাতু ছেদন অর্থেও পালিতে ব্যবহার আছে।

√কড্ হইতে কাড়া শব্দের উৎপত্তি, √কৃষ্ হইতে নহে; √পুঞ্ছ্ হইতে "পোঁছা" শব্দের উৎপত্তি, যদিচ ইহা সং প্র+ √উঞ্ছ হইতে আগত মনে করা হয়; "অক্খীনি পুঞ্ছিত্বা"—চোখ মুছে, "পুঞ্ছিত্বা" রূপও পাওয়া যায়। √দিক্খ ধাতু হইতে দেখা—"দক্খতি"— √দৃশ্ ধাতু হইতে নহে। √আছ্ ধাতু হইতে বাংলা "আছে"; √আস্ বা √অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা ঠিক নহে। √বিন্ ধাতু হইতে "বিনাতি" (= "সং সিব্বতি")—"বিনিত্বা কতং" বিনাইয়া করা। বাংলা "বিনান," "বিনুনি" ইত্যাদি শব্দ এই ধাতুনিষ্পন্ন। √ফাড্=ফাড়া, ফাটা—কট্ঠং ফাড়েতি=কাঠ ফাড়া। √হু (সং √ভূ)=হওয়া। √তিম্=ভিজা, তিন্ত—বাংলা পন্তে "তিতা"। √নিজ্ঝ্=নিড়ান—"নিদ্দায়িতব্ব," "নিদ্ধেহি" বা "নিজ্ঝেহি" (তিণাণি—তৃণানি); "নিস্তৃণ" হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত। সং ঘৃষ্ <* ধর্স <ধংস (যেমন "লোমহর্ষণ" হইতে পালি "লোমহংস"; বাংলা "ঘামসানো" শব্দ এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

*　　*　　*　　*

অনেক বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি পালি হইতে নির্ধারণ করা সহজ, এবং অভিধানে তাহার উল্লেখ থাকা বিধেয়।[১৪]

হেঁট, হাঁটু, হেঁটো <হেট্ঠা <সং অধস্তাৎ ('অ' ও অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ, "ধ"এর "হ"এ ও "স্ত"এর "ট্ঠ"এ পরিবর্তন হইয়াছে। শব্দটি "অবহিত্থ" হইতে নিষ্পন্ন নহে।

পাচন (-বাড়ি) —পালি পাচন, √অজ্ নিষ্পন্ন—জকার চকারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

ঝামা <ঝাম— √ঝা=পোড়া; তুঃ ঝাম্ব, ঝুনো। একজন লেখকের মতে "ঝুন্‌ঝুনিয়া" শব্দ হইতে "ঝুনা" আসিয়াছে।

লাঠি লট্ঠি।

আঁব (কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত) <অম্ব। অভিধানে এ শব্দটি নাই।

অম্বল<অম্বিল। সংস্কৃত "অম্ল" শব্দে বকার নাই; সেইরূপ তাঁবা<তম্ব<তাম্র।

দহ, দ, দক (শেষোক্ত শব্দের উল্লেখ অভিধানে নাই। <দহ<* হদ<হ্রদ। দোহারা

১৪। কতকগুলি পালি শব্দ হুবহু বাংলায় স্থান পাইয়াছে, যেমন ঘর, বাহির, রক্তকম্বল (পালি—রত্তকম্বল, পুপ্পবিঃ), বাহির<বাহিত্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ<পোংখানুপোংখ ইত্যাদি।

<দহর। "দহর" (বৈদিক দহ্র)=ছোট, তরুণ। পালি দহর পক্‌খী, দহরী কুমারী। দোহারা শব্দটি "দহর" হইতে কিংবা "দুই হয়া" হইতে নিষ্পন্ন, সুধীগণ বিচার করিবেন। মনে হয়, যেন "দহর"এর "দ," "দো"কে "দুই" অর্থে ধরিয়া "একহারা"র সৃষ্টি হইয়াছে।

কসটে<কসট<সং সকট (তিক্ত), বর্ণবিপর্যয়; "কষায়" শব্দের সহিত গোল বাঁধিয়া "তাঁবাটে," "পাগলাটে" প্রভৃতি বিশেষণ-পদের অনুকরণে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পৈশাচী রূপও 'কসট'—"কষ্ট" শব্দ হইতেও ব্যুৎপত্তি ধরা হয়।

গেরুয়া<গেরুক গৈরিক।

উপোস উপোসথ<উপবসথ।

খিল<খাল কীল।

সুঠাম<সুসঠান<°সংস্থান।

পাড়<পাড়ি, পালি।

বাট<বটুম<বর্ত্ম্।

বোঁটা, বাঁট<বণ্ট<বৃন্ত।

ননী<নোনীত<নবনীত। "নোনী" বানান হইলেই অশুদ্ধ হয় না।

লাউ<লাবু<অলাবু।

বাকল<বাক<বল্কল।

ঘুঁটি<ঘটিকা<গুটিকা।

নেলা (-ক্ষেপা)<পালি "লাল"=মূলবুদ্ধি (লাল্ উদাসী)।

লোনা<লোণ<লবণ।

সোনা<সোণ্ণ<স্বর্ণ।

নাটা (হিন্দী)<লকুচক।

আঠার<অট্ঠারস।

ভূষি<ভূস<বুষ।

থাম<খম্ভ<স্তম্ভ।

পেথম<পেখুম।

শেজ<সেয্যা<শয্যা।

ওলন<ওলম্বন<অবলম্বন।

ত্রিপল<তিপল্ল (তিনপাট)।

যত, তত, কত, এত<(যথানুক্রমে) যন্তক, তন্তক, কিন্তক, এন্তক।

বাঁকা<বঙ্কা; সেইরূপ সাঁক<সঙ্কা। অনুনাসিকের সহিত স্পর্শবর্ণ থাকিলে এইরূপ বিকৃতি হয়—তুঃ সাঁড়াশি<সণ্ডাস, কুঁড়া<কুণ্ড, পাঁতি<পন্তি<পঙ্‌ক্তি।

পালকি<পাটঙ্কী। সংস্কৃত পল্যঙ্কিকা।

মেদা<পালি মিদ্ধ=জড়তা। ইহার সহিত "মেদ" চর্বি জড়িত হইয়াছে।

থুথুড়ে, থুথুড়ী < থের, থেরী < স্থবির, স্থবিরা।

দাঁড় (কাক) < ধ্বঙ্ক < সং ধ্বাংক্ষ; দণ্ড শব্দের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ "দাঁড়"এ দাঁড়াইয়াছে।

না < নাবা < নৌ।

ছক্কা, ছক < ছক্ক < ষট্‌ক।

নাওয়া < √স্না < স্না।

দু-(আনি) < তুঃ "দু"পট্ট (দোপাট্টা), "দু"বিধ।

কণা < কণ (কুঁড়া; "খুদ" অর্থ নহে)—খুদ কণা = খুদকুঁড়া।

বিশ < বীস < বিংশ।

হে দে < হন্দ < সং "হস্ত"।

গাভী < গাবী < গবী।

পুঁটকে < পোতক; অশোকানুশাসন, শিলা ৯ "পুতিক"।

ধাঁধা < দন্ধ (মন্থর)। "চলন্তিকা"মতে "দ্বন্দ্ব"শব্দনিষ্পন্ন।

হেথা < এথ < অত্র।

পাউস (গ্রাম্য < পাবুস < প্রাবৃষ্।

শিমুল < সিম্বলি (বৈদিক "শিম্বল") সংস্কৃত শাল্মলী।

কিসে < কিস্‌স—"কিস্‌স পন মে ত্বং অজ্জো পুরিস ভবিয়ং নেসি? = কিসের জন্য, ওহে মানুষ, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ?

বেল < বেলুব < বিল্ব।

তুমি < পজ্জে তুবং।

(হিম-) সিম < সীন < শীন = জমিয়া যাওয়া—'সিম' শব্দটি প্রতিধ্বনিসূচক নহে। রেখে, ঢেকে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অনুরূপ অভিশ্রুতি পালি দুই একটি শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়—"পাটিহারিয় বা পাটিহের," "অচ্ছরিয় বা অচ্ছের"।

"অপর্য্যাপ্ত" শব্দটি অত্যধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়—এইরূপ অর্থে পালিতে শব্দটির প্রয়োগ আছে—"অপরিযত্তি (অপর্য্যাপ্তি)-কর" শব্দের অর্থ "অতিতিত্তিকর" (অতিতৃপ্তিকর)। অতএব, "অ" বা "অন্" শব্দের অন্য এক অর্থ "অতি"। এই শ্রেণীর শব্দ "অনুত্তম," "অনাবৃষ্টি," অনাসৃষ্টি।[১৫] বাংলায় অকার কচিৎ দীর্ঘ হইয়াছে; পালি "অনভাব"(= অবড্‌চি—অবৃদ্ধি), অনচ্ছরিয় = অত্যন্ত আশ্চর্য—ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের মতে এই শব্দটি অনু + অচ্ছরিয় হইতে নিষ্পন্ন; তাহা মোটেই নহে। "অনমতগ্‌গ"—যাহার অগ্র অজ্ঞাত—শব্দটি সংসারের বিশেষণ, সংসার—যাহার আদি অবিদিত। এই শব্দের ব্যাখ্যা নানা জনে নানা প্রকার করিয়াছেন, যথা—অনু + অমতগ্‌গ; অন্ + অমত; অ + নমৎ; অন্ + আমত (°মৃত)

১৫। যোগেন্দ্রবাবুর বাংলা শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু "অন্" এখানে অভাবাত্মক পদ নহে ; দুই "না" মিলিয়া এক "হাঁ"—তাহাও নহে ; "অন্" বা "অ" এ স্থলে অত্যন্তার্থে ব্যবহৃত ; অর্থাৎ যাহা একেবারে অজ্ঞাত। তুলনীয় এডমুক = অনেডমুক।

শ্রীঈশান ঘোষ-কৃত জাতকের অনুবাদের উপক্রমণিকায় (১৷৵০ পৃঃ) কতকগুলি বাংলা শব্দের পালি ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। ঐ তালিকাভুক্ত "জুজু" শব্দের ব্যুৎপত্তি সঠিক হইলে উহা কোনও ফারসি শব্দের বিকৃতি হইতে পারে না, এবং উ "উ" হইবে ; কারণ, মূল নামের বানান "জুজক"। "ছন্দ" শব্দ হইতে চাঁদা, সেইরূপ "চাঁদা" শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে—যাহা ইচ্ছা করিয়া লওয়া হয় ; ইহার আভিধানিক ব্যুৎপত্তি কিন্তু √ছাঁদ (বণ্টন) হইতে ধরা হয়।

* * *

পালি ইডিয়ম সংস্কৃত হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য-বিন্যাসের অনেকগুলি প্রাকৃত সাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে ; অপাংক্তেয় বলিয়া আভিজাত্যপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাদের স্থান হয় নাই।

ভাত বাড়ছে < ভত্তং বড্ঢেতি ; সেইরূপ "কুত্তং বড্ঢেতি" ; "ভাত বাড়াইতেছে" হওয়া উচিত, যেমন "গাড়ি বাড়াও"। শব্দটি "বণ্টন" হইতে আসে নাই ; "বণ্টন"এর অর্থ ভিন্ন।

এঁড়ে কথা < অণ্ডক বাচা—"স-দোসবাচা" দোষযুক্ত কথা (জাতক নং ৩৮২)।

নরকে পচিতেছে < নিরয়ে পচ্চতি (পিণ্ডন্ত)।

ওহে, আমি আসি < আযামি, আবুসো।

সূতা কাটিতেছে < সুত্তং কন্তেতি। সংস্কৃত √কৃৎ।

রাজ্য দুই ভাগ করিয়া < রজ্জং দ্বে ভাগে কত্বা।

একটি দেবতাকে জরাজর্জ্জর করিয়া দেখাইয়াছিলেন < একং দেবপুত্তং জরাজজ্জরং কত্বা দস্সেসুং।

হাত করে < হত্থগতং কত্বা।

দেরী করিতেছে < চিরং করোতি।

প্রস্রাব করিতেছে < পস্সাবং করোতি।

সঙ্কেত করিতেছে > সঞ্ঞং করোতি।

কলহ করিতেছে < কলহং করোতি।[১৬]

হাতে ক'রে পরখ করা < হত্থে করিত্বা পচ্চবেক্খিয্য।

প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিল < থুতিং কত্বা কত্বা কথেসি।

শত সহস্র করে (দিনে দিনে দান করেন) < সতসহস্সং কত্বা।

চার চার করে হাজার ঘা < চতুক্কে চতুক্কে পহারসহস্সং।

১৬। কৃ ধাতুর এইরূপ প্রয়োগ সংস্কৃতেও অল্পবিস্তর দেখা যায়।

রূপ যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে< যাতা ছিজ্জিত্থা ছিজ্জিত্থা পতন্তি বিয়।

রথ তালবন কাটিতে কাটিতে (চলিল)<রথো তালবনং ছিজ্জিত্থা ছিজ্জিত্থা।

ঠেস দিয়া দিয়া কথা বলিল<আসজ্জ আসজ্জ অবচাসি; সেইরূপ "উপনেয্য উপনেয্য অবোচ"।

এই এই কর<ইদঞ্চ ইদঞ্চ করোথ।

তোমায় আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেও<তং অহং পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো।

সংক্ষেপ করিয়া করিয়া<সংখিপিত্থা সংখিপিত্থা।

সময় কাটিতে লাগিল<গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে।

তোমরা গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া নিদ্রা যাও<তুম্হে গহপতিকেন দিন্নং ভুঞ্জিত্থা ভুঞ্জিত্থা সুপথ।

এই প্রকারের নিরন্তরতাপ্রকাশক দ্বিরুক্ত শব্দ অনেক পাওয়া যায়।

খান্ খান্ (টুকরো টুকরো) হয়ে ভেঙে গেল<খণ্ডং খণ্ডং ভিজ্জিংসু।

সাক্ষ্য দেওয়া<তুলঃ সক্খি করোতি—ইহার সংস্কৃত করা হইয়াছে, "সাক্ষাৎ করোতি," কিন্তু বাংলা ইডিয়ম "গা করে না" ইত্যাকার বাক্যের সহিত "সক্খি করোতি"। স+অক্ষি—"সাক্ষি করা" বা "সাক্ষি দেওয়া" মলিয়া যায়।

জলজীয়ন্ত বেঁচে আছে<জলমানো জীবতি।

হাতের পাশে<হত্থ পসসে।

আলাপ সালাপ<অল্লাপ সল্লাপ।

আঁকু পাঁকু<অকুল, পকুল।

কাঠের আগুন, খড়ের আগুন, ঘুঁটের আগুন, তুষের আগুন<কট্ঠগ্গি, তিণগ্গি, গোময়গ্গি, থুসগ্গি।

সে আমার অনেক করেছে<বহুকারো সো।

কাজ কি, কাজ নেই<কিচ্চং নত্থি, কম্মং নত্থি।

হেলাখেলা<হীড়িত খীড়িত।

পড়িয়া গেল<পতিত্থা গতং।[১৭]

মৃত্যু লইয়া যায়<মচ্চু আদায় গচ্ছতি।

যবাগু পাক করিয়া দিয়াছিল<যাগুং পচিত্থা অদাসি।

কাজ করিয়া দিয়াছিল<সম্পাদেত্থা অদংসু।

লিখিয়া রাখে<লিখিত্থা ঠপেন্তি।[১৭]

আসিতে দিবে না<আগন্তুং ন দস্সন্তি।

১৭। এই প্রকার ইডিয়ম হিন্দী কেন, বর্মাভাষায়ও বহু পাওয়া যায়—"চা ত্থা" পড়িয়া যাওয়া, "মে ত্থা" ভুলিয়া যাওয়া, "পে ঠা" দিয়ে রাখা, "পেই ঠা" ভেজিয়ে রাখা, "তে পিট্" মেরে ফেলা।

সন্ন্যাসী হইতে দিই নাই < পব্বজিতুং নাদাসিং।
দাড়ি ছাঁটা < মসুস্থং কপ্পেতি।
চুলচেরা < বালবেধী।
সুদখোর < লঞ্চখাদক।
খড়কে খাওয়া < তুলঃ দন্তকট্ঠং খাদতি (দাঁতন খাওয়া)।
এদের ঠকিয়ে খা'ব < ইমে বঞ্চেত্বা খাদিস্সামি।
দেবতা বর্ষায় < দেবো বস্সতি। তুলঃ "দেবতা ডাকছেন"।
ধারা বর্ষণ < ধারা পবস্সেয্য।
রাখা ঢাকা < রক্খাবরণ = রক্খা + আবরণ।
ঋণ শোধ করা < ইণং সোধেতি।
ক'ষে মালকোচা মেরে < গাঢ়ং কচ্ছং বন্ধিত্বা। তুলঃ "কোমর বেঁধে"।
বড় অসুস্থ < বাঢ় গিলান।
বেলাবেলি < দিবা দিবস্স।
বেলা ক'রে উঠা < দিবা বুট্ঠাতি।
অসুখ থেকে উঠা < গিলানা বুট্ঠিত।
পর্ণগ্রাহী < পল্লগ্গাহী।
রাগে টর্ টর্ করা < রোসেন তট্টতট্টায়তি।
সখী তিন জন < সখিনো তীণি জনিও।
পাঁচ জনের সঙ্গে < পঞ্চগ্গং সদ্ধিং।
গান বাঁধা, ছড়া বাঁধা < তুলঃ গাথং বন্ধাপেত্বা, বগ্গং বন্ধাপেত্বা।
যখন চ'লে ফিরে বেড়াতে পারে < আধাবিত্বা পরিধাবিত্বা বিচরণকালে।
আজ থেকে < অজ্জতগ্গে (অজ্জতঃ অগ্গে)।[১৮]
বুক চাপড়ান < উরত্তালি।
গ্রাসাচ্ছাদন < ঘাসচ্ছাদন।
তার পায়ের ধুলার যোগ্য নয় < পাদরজং ন অগ্ঘতি।
দেবদত্ত চিকিৎসার বাহিরে < দেবদত্তো অতেকিচ্ছো।

আপনারা থামুন < তিট্ঠথ ভুম্মে, অহট্ঠো মাণবো ময়া সদ্ধিং মন্তস্সু (যুবক অপেক্ষা আমার সঙ্গে বিচার করুক)। তুলঃ ইদানি ব্রহ্মা তাব তিট্ঠতু—এখন ব্রহ্মা তা'লে থাকুন, তিট্ঠতু ভবং গোতমো, আপনি দাঁড়ান, গৌতম।

এখন তাঁহার ধর্মকথা শুনিতে পাইব < ইদানস্স ধম্মং সোতুং লভিস্সামি।

১৮। "'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে জানিলে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না…"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষাপরিচয়, ১৪৬ পৃঃ।

নিজেরই আসিতে হইবে<অত্তনো ব আগন্তব্বং।

কিন্তু কে তার সঙ্গে মামলা করবে<কো পন তেন সদ্ধিং অট্টং করিস্সতি।

তাঁর দেখা পাওয়া ভার<(বিহারং গন্ত্বা) দট্ঠব্বং নাম ভারো।

যেমন কি<যথা কিং।

এই যে পূজা বন্দনা<যা অয়ং বন্দনপূজনা।

সেই ব্যক্তি যে<যো সো পুরিসো।

এ ধর্ম নয় যে, আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি<ন সো ধম্মো যং তং জহে।

কি করিবে সেই কামুকের বিবিক্তিসেবা?<কিং করিস্সতি তস্স বিবেকতা কামগুণ-গিদ্ধস্স?

কাল যাবেন এখন<স্বে' দানি ভবং উপসংকিমিস্সতি।

এই এক সময়ে, মশাই<একং ইদাহং (ইদং+অহং), ভন্তে, সময়ং।

তুমি এটা কি মনে কর?<তং কিং মঞ্ঞসি?

এ কি তুমি শুনেছ?<কিন্তি তে সুতং?

রাজা যা (খুশি) তা করুন<রাজা যং বা তং বা করোতু।

যা হবার হোক<যং হোতু তং হোতু।

যা ইচ্ছা, তাই বলছে<ইচ্ছিত ইচ্ছিতং কথেতি।

ওহে, তুমি যে আত্মার কথা বলছ, তা আছে, তা নেই যে তা বলি না<অথি চ খো সো তো অত্তা যং ত্বং বদেসি, নে' সো নত্থীতি বদামি।

অতীতে তুমি ছিলে, না ছিলে না?<অহোসি ত্বং অতীতং অদ্ধানং, ন ত্বং নাহোসি? এখানে একটি "ন" জিজ্ঞাসার্থক ("এত্থ একো নকারো পুচ্ছনত্থো হোতি"।) তুমি তবে আছ, না তুমি নেই?<অথি ত্বং এতরহি ন ত্বং নত্থি?

প্রথম ব্যক্তিও দেখিতে পায় না, দ্বিতীয় ব্যক্তিও দেখিতে পায় না, শেষ ব্যক্তিও দেখিতে পায় না<পুরিমোপি ন পস্সতি, মজ্ঝিমোপি ন পস্সতি, পচ্ছিমোপি ন পস্সতি। প্রত্যেক শব্দের পরে "ও"এর ব্যবহার, যেমন তুমিও ছোট ছিলে, ওও ছোট ছিল। "ভগবা পি অসীতিকো, অহম্পি অসীতিকো"—ভগবান্ বুদ্ধেরও আশী বৎসর বয়স, আমারও।

সমানে বৃষ্টি পড়ছে, সমানে দাঁড়িয়ে ভিজছে—ধনিয়সুত্তে "সমানবাস" শব্দের অর্থ করা হয়, সমান ব্যক্তির সহিত বসবাস, কিন্তু বাংলা অনুযায়ী ইহার অর্থ "বহুকাল ধরিয়া" বাস সঙ্গত মনে হয়। কারণ, "সমানবাস"এর সহিত পরবর্তী শ্লোকের "এক রাত্রি বাস"এর তুলনা করা হইয়াছে, এবং ধনিয়সুত্তে সর্বত্র গৃহী ও সন্ন্যাসী জীবনের তুলনা করা হইয়াছে।

"টাকার কুমীর" প্রবাদটির ব্যুৎপত্তি করা হয়—কুবের ও কুম্ভীর, এই শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণ হইতে।[১১] কিন্তু "সে টাকার কুবের" এরূপ বাক্য অপেক্ষা "সে কুবের" এইরূপই ব্যবহার

১১। শ্রীসুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত," ৮৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

হয়। সুমঙ্গলবিলাসিনী নামক পালি ভাষ্যগ্রন্থে কুম্ভীর নামে রাজগৃহবাসী জনৈক যক্ষরাজের উল্লেখ আছে। তিনি শত সহস্র যক্ষের অধিপতি ছিলেন। "রাজগহং নগরে নিব্বত্তো কুম্ভিরো নাম যক্খো" (৬৮৬ পৃ.)। কথায় বলে "যথের ধন"। এখন জন্তু কুম্ভীর, না যক্ষ কুম্ভীরের সহিত গোল বাধিল, তাহাই বিবেচ্য।

কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক, দৃশ্যাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দ বাংলার নিজস্ব সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হয়। পালিতে অনুরূপ শব্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়—ভর ভর, সর সর, সস্‌সর (কাঁচা চামড়ার শব্দ), চিচ্চিটায়তি, চিটিচিটিয়ায়তি (উত্তপ্ত লৌহে জল ছিটাইলে), গড়গড়ায়তি (আকাশ), বিড়িবিড়িকা (বিড়বিড় করিয়া বকা—থেরগাথা, ১১৯), তিপতিপায়তি (বেদনাত্মক), তটতটায়তি (রাগে)।

* * * *

ব্যাকরণেও প্রাকৃতের প্রভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী সংস্কৃতের ন্যায় কঠোর নহে। শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, এইরূপ সন্ধি সংস্কৃত অনুযায়ী না হইয়া পালি নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "এক" শব্দ যোগে বাংলাতে আমরা "ক্ষণেক," "বারেক," "শতেক," "তিলেক" ইত্যাদি সন্ধিবদ্ধ পদ পাই—ইহাও পালি সূত্রানুযায়ী। প্রাকৃতে যেরূপ, বাংলায়ও তদ্রূপ সন্ধির নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই। পালি "হথি আদি" বা "আয়স্মা আনন্দ" শব্দদ্বয়ে সন্ধি হয় নাই, বাংলায় সেইরূপ হিত উপদেশ (ও হিতোপদেশ), পরম আনন্দ (ও পরমানন্দ), উপরি উক্ত বা উপর্যুক্ত ইত্যাদি দুই প্রকার ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলায় অশুদ্ধ সন্ধিবদ্ধ পদ—দুরাদৃষ্ট, যদ্যাপি ইত্যাদির সহিত পালি সো + অহং = সোহং, খো + অহং = খোহং তুলনীয়। পালি সন্ধিবিশেষে পদদ্বয়ের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের আগম হয়—যথা, ইতো + আয়াতি = ইতো—ন্—আয়াতি ; সেইরূপ বাংলা কুল—ন্—পাড় ; পালি অঞ্ঞ + অঞ্ঞসস = অঞ্ঞমঞ্ঞসস, বাংলা খোলাম্ কুচি।

সমাসের নিয়মও প্রাকৃত ভাষায় শিথিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে দাসিপুত্র, সুন্দরিগণ প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে দাসিদাস, নদিতীর ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং প্রাকৃত নিয়মানুসারে কালিদাস, দেবিদাস শুদ্ধ সমস্তপদ। "শারীপুত্র" পদ পালিতে "সারিপুত্ত" হয় বলিয়া সংস্কৃতেও চালু হইয়া গিয়াছে। কবিকল্পনায় শুকের স্ত্রী শারী।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে নিরহঙ্কারী, কলহংশীলা ইত্যাকার পদ অশুদ্ধ ; পালিতে কিন্তু আমরা নিন্দাশীলী (° শীলী), সভাসীলী, সত্তপন্নী (সপ্তপর্ণী) প্রভৃতি পদের ব্যবহার পাই। নির্দোষী ইত্যাদি পদ সংস্কৃতে অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে নিক্কামী (নিক্কামিন্) পদ পাওয়া যায়। অতএব বহুরূপী ইত্যাদি পদ মোটেই অশুদ্ধ নহে।

বাংলায় "ইচ্ছিত," "স্পর্শিত" প্রভৃতি 'ক্ত'প্রত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যাকরণসম্মত নহে, কিন্তু পালিতে "ইচ্ছিত," "ফস্‌সিত," উদ্ধিলিত (উদ্বেলিত) প্রভৃতি শব্দ শুদ্ধ—পাশাপাশি তদ্ভব

ইট্‌ঠ (ইষ্ট) ও ফুট্‌ঠ (স্পৃষ্ট) শব্দের ব্যবহার আছে, যদিও ইট্‌ঠ ও ইচ্ছিত, ফুট্‌ঠ ও ফস্‌সিত শব্দদ্বয়ের অর্থের তারতম্য আছে। প্রাকৃতে "ক্ত" ইত্যাদি প্রত্যয় ধাতুর উত্তর প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই—বপিত (√বপ্), বুসিত (√বস্), ইত্যাদি অনেক পদ পালিতে ব্যবহৃত হয়।

মৃগিণী, সিংহিণী সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে মিগিণী, সীহিণী প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। "রজকিনী" যদি চালু হয়, মৃগিণী, বাঘিনী, কুরঙ্গিণী, বিহঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, চাতকিনী প্রভৃতি অশুদ্ধ বলা গোঁড়ামি ছাড়া কিছু নহে। "অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত", অভিধানের এইরূপ শব্দবিভাগ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। বাংলা পেত্নী শব্দ পেতিনী (তুলঃ পালি "মিগিনী") শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন, "প্রেতী" শব্দ হইতে হয় নাই।

"উচ্ছন্ন' শব্দটি অশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। পালিতে বহুশঃ "ৎস" "চ্ছ"এ পরিণত হয়—মৎস্য > মচ্ছ, বৎস > বচ্ছ (বাচ্ছা), কুৎসিত > কুচ্ছিত—বাংলায়ও কুচ্ছিত, মহোচ্ছব প্রভৃতি শব্দ কথিত হয়। পালিতে কিন্তু উৎসন্ন = উস্‌সন্ন।

মহারাজা পদ সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে। পালিতে শুদ্ধোদন মহারাজা পদ শুদ্ধ।

পালি শব্দরূপে মহৎ শব্দের প্রথমার একবচনে "মহা" হয়, সেই হেতু সমস্ত পদ ছাড়াও বিশেষণরূপে "মহা" ব্যবহৃত হয়, যেমন "মহা হি এসো সমাগমো," সেইরূপ বাংলায় "মহা আদর," "মহা মুস্কিল।"

বাংলায় যেমন "ঈ" প্রত্যয় ভক্তিসূচক, যথা—শ্রীদুর্গার আগমনী, পালিতে সেইরূপ "বেরমণী" ইত্যাদি পদ দৃষ্ট হয়—"পাণাতিপাতা বেরমণী" (প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি)। "ইন্" প্রত্যয়ান্ত শব্দে পালিতে কখনও কখনও 'ঈ'কারের পরিবর্তে 'ই' ব্যবহার হয়, যেমন সেট্‌ঠি (শ্রেষ্ঠী)। বাংলায়ও "হাতি" ইত্যাদি শব্দে 'ই'কারও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতে যেখানে বিধিলিঙের ব্যবহার হয়, পালি ও বাংলায় সে স্থলে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়, যথা, "তা হবে" = পালি "ভবিস্‌সতি" = সং "ভবেৎ"।

কথ্য বাংলায় অন্ত্য স্বরের উকারে পরিবর্ত্তন আদরসূচক—রামু, হাবু ইত্যাদি ; পালিতে উকার সম্মানজ্ঞাপক—সব্বঞ্ঞু (সর্ব্বজ্ঞ, বুদ্ধ), বিঞ্ঞু (বিজ্ঞ), পারগূ (পারগ), বেদগূ (বেদজ্ঞ)। বাংলায় উকার কিন্তু নিন্দাবাচক, যেমন বিচ্ছু, ছেলে।

পরিশেষে বক্তব্য, সংস্কৃত মতে শুদ্ধ না হইলেই বাংলা পদ বা ইডিয়ম্ অশুদ্ধ হয় না। আর কত কাল আমরা সংস্কৃতের অঞ্চল ধারণ করিয়া চলিব ?

পঞ্চম বেদসার নির্ণয়

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে অগণিত তন্ত্রনিবন্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে বাংলার তন্ত্রসাধনার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইহাদের অল্প কয়েকখানি মাত্রই আজ সুপরিচিত।[১] অবহুপরিচিত অনেকগুলি গ্রন্থের কথা বিভিন্ন পুথিশালার বিবরণের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে।[২] যাহাদের কোন বিবরণ বা আলোচনা এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই, এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ একখানি গ্রন্থের[৩] পরিচয় আমি কিছু দিন পূর্বে এই পত্রিকায় দিয়াছি। বর্তমানে আর একখানির পরিচয় দিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম—পঞ্চমবেদসার নির্ণয়। রচয়িতার নাম—হরগোবিন্দ রায়। ইহা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ—ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষার্ধ। গ্রন্থকারের প্রপৌত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের যে পুথি দেখিয়াছি, তাহাতে পুথির লিপিকাল ও অনেক স্থলে গ্রন্থের রচনাকাল উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের দুইখানি পূর্ণাঙ্গ পুথি ও একখানি পুথির খণ্ডিত শেষ পত্রে ইহার রচনাকাল ১৭৪১ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন পুথিতে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পৃথক্ পৃথক্।[৪] একখানি পুথির লেখক রামচন্দ্র,[৫] আর একখানির সর্বেশ্বর। সর্বেশ্বরের লিখিত পুথির লিপিকাল—১৭৪৫ শকাব্দ।[৬]

দ্বিতীয় খণ্ডের দুইখানি পুথির মধ্যে একখানি খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথিতে লিপিকরের

১। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার, ব্রহ্মানন্দের শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তারারহস্য, পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও শ্যামারহস্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণতোষণী ইত্যাদি।

২। কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের শ্যামাসপর্যাবিধি, কৃষ্ণমোহনের আগমচন্দ্রিকা, যদুনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্ররত্নাকর, রঘুনাথ তর্কবাগীশের আগমতত্ত্ববিলাস, রত্নমাভ আগমাচার্যের সুন্দরীরহস্যবৃত্তি, রামগোপাল শর্মার তন্ত্রদীপনী, শঙ্কর আগমাচার্যের তারারহস্যবৃত্তিকা, চন্দ্রশেখরের পুরশ্চরণচন্দ্রিকা ও কুলপূজনচন্দ্রিকা, জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি।

৩। অমর মৈত্রেয় জ্ঞানদীপিকা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৮ খণ্ড, পৃ. ৪০-১)।

৪। শাকে ভূমিবিধাতৃবস্তু মুনিভূমানে গতে হায়নে চৈত্রে মাসি পলাশধামবিলসৎশ্রীহট্টদেশেঽতুলে।
যোগিধ্যাস্তনিতান্ততোষণকরং জ্ঞানৈকমোক্ষপ্রদং বিদ্বন্মোদনসৃষ্টিকাণ্ডকখিতং তন্ত্রং সমাপ্তিং গতম্ ॥
শাকে ভূবেদভূভূদ্‌ভূমিতে শরদি চৈত্রকে। সৃষ্টিকাণ্ডং পলাশে তু শ্রীহট্টান্তে সমাপিতম্ ॥
শাকে খ্যৌবেদস্মাভূচ্চন্দ্রমা পরিমাণকে। সমাপ্তং সৃষ্টিকাণ্ডঞ্চ শ্রীমদীশপ্রসাদতঃ ॥

৫। লিখিতং পুস্তকং চেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা। শ্রীমতো হরগোবিন্দ রায়ধীরস্য হেতুনা।

৬। শাকে শৈবাস্যবেধোমুখমুনিরজনিনাথসংগণ্যবর্ষে পুস্তীং রম্যাং লিলেখাবনিবিবুধ ইমাং শ্রীলসর্বেশ্বরাখ্যঃ।

নাম রামচন্দ্র ও লিপিকাল বা রচনাকাল ১৭৪২ শকাব্দের উল্লেখ আছে[৭]। ইহার কাগজ কলে প্রস্তুত—ইহা হাতে তৈয়ারি কাগজে লেখা খণ্ডিত পুথির নকল হইতে পারে।

তৃতীয় খণ্ডের পুথিখানির কিছু অংশ প্রাচীন ও কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত নবীন। একখানি পাতার লেখা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আরম্ভ অন্তরূপ। ইহা গ্রন্থকারের মুসাবিদার নিদর্শন হইতে পারে। পুথির শেষে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি অংশতঃ ত্রুটিত[৮]—পাতার উপরের দিকে অন্য শ্লোকে[৯] রচনাকাল (১৭৪৩) ও লিপিকরের নাম (রতিকান্ত) উল্লিখিত হইয়াছে। একই বিষয় এই ভাবে দুই রকমে নির্দেশ করিবার কারণ বুঝা যায় না।

চতুর্থ খণ্ডের রচনাকাল ১৭৪৪ (?) শকাব্দ—পুথির লিপিকর রামচন্দ্র।[১০] পঞ্চম খণ্ডের রচনাকাল উল্লিখিত হয় নাই। ইহার পুথি ১৭৪৫ শকাব্দে সর্বেশ্বর কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।[১১] ষষ্ঠ খণ্ডেও রচনাকালের উল্লেখ নাই—পুথির লিপিকাল ১৭৪৪ শকাব্দ—লিপিকর সর্বেশ্বর।[১২]

এই বিশাল গ্রন্থের রচয়িতা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বিশেষ কোনও পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। নিজের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি প্রতি খণ্ডের প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় সগৌরবে কেবল গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীনাথ দেবস্বামী মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীসর্বচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন। পুথির লিপিকর সর্বেশ্বর ইঁহাকে প্রবলপ্রতাপান্বিত খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের লেখা হইতে বুঝা যায়, শ্রীহট্টের অন্তর্গত পলাশ পরগণা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এইখানেই তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের অন্যতম সুযোগ্য বংশধর ও গ্রন্থের পুথির একমাত্র রক্ষক শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে জানা যায় যে, হরগোবিন্দ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শ্রীবাড়ীর রঘুনাথ (দত্ত) রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বাল্যকালে

৭। শাকে দ্বিবেদশৈলেন্দৌ দীক্ষাকাণ্ডং সমাপ্তকম্। লিখিতং পুস্তকক্ষেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা।

৮। ...ত্রোদধিস্মাভূদবনিপরিগণিতে...ম্বভুক্ তীক্ষ্ণ রশ্মের্বেব...শেষ্হি জৈবে মধুসিমুবিপিনে স্বীয়শাস্তে পলাসে।
দেশে গ্রন্থং সমাপি বুধভয়...র্মকাণ্ডাভিধানং বিধমল্লুং প্রবন্ধাদ্বুধনতহরগোবিন্দরায়ঃ সুধীঃ।
আজ্ঞয়া হরগোবিন্দরায়স্যৈব দয়ানিধেঃ। ব্যলিখৎ শ্রীরতিকান্ততর্কসিদ্ধান্তনামকঃ॥

৯। শাকে ত্রিবেদস্মাভূচ্চন্দ্রসাপরিমাণকে। সমাপ্তং কর্মকাণ্ডঞ্চ শ্রীমদীশপ্রসাদ[তঃ]।
লিখিতং পুস্তকক্ষেদং রতিকান্তদ্বিজাতিনা। শ্রীলশ্রীহরগোবিন্দরায়ধীরস্য হেতুনা।

১০। শাকে বেদব্রহ্মস্মাভূচ্চন্দ্রসমাপরিমাণকে। ইষে মাসি পঞ্চমাংশে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে।
সমাপ্তং বৈ জ্ঞানকাণ্ডং শ্রী[মদীশপ্রসাদতঃ]। লিখিতং পুস্তকক্ষেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা॥

১১। কীর্তিস্তোতিতবিশ্ববস্তুমিখিলস্মাপালভূপালকযৌজঃখর্বিতবৈরিদর্পহরগোবিন্দাখ্যরায়াজ্ঞয়া।
শাকে বাণযুগাব্রিচন্দ্রগণিতে বর্ষে শুচীশাংশকে। শ্রীসর্বেশ্বরকুন্দুরো বুধদিনে পুস্তীমিমামালিখৎ॥

১২। শাকে বেদকৃতর্বিচন্দ্রগণিতে মাসে মধৌ কৃষ্ণকে পক্ষে চন্দ্রদিনে লি[লে]খ নিভৃতাং পুস্তীমিমাং সাদরঃ।
শ্রীসর্বেশ্বরকুন্দুরো হরিতিথৌ কীর্তীশ্বদীপ্তাখিল-শ্রীলশ্রীযুতভূমিপালহরগোবিন্দরায়াজ্ঞয়া।

হরগোবিন্দ চঞ্চলপ্রকৃতি ও পাঠাভ্যাস বা অন্য কার্যে অমনোযোগী ছিলেন। একদিন অগ্রজ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া হরগোবিন্দ গৃহত্যাগ করেন এবং দক্ষিণ-বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র চণ্ডীপুরে যাইয়া বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। শিক্ষার্থী অবস্থায় হরগোবিন্দ ১১৮৯ বঙ্গাব্দে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের একখানি নকল প্রস্তুত করেন। নকলখানি শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে। প্রথম শিক্ষার্থীর লেখা বলিয়া ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির প্রাচুর্য দেখা যায়। কালক্রমে হরগোবিন্দ সংস্কৃত ও ফার্সীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি পশ্চিমে পাজিপুর হইতে রাজমহল, যশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও শ্রীহট্ট, এই কয়েকটি জেলায় কালেক্টরের দেওয়ান হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ইহাদের অনেক স্থানে তিনি ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তবে লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহাকে সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত করে নাই। অবসরমত তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন এবং নিজে গ্রন্থরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলি আলোচনা করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিরক্ষক স্বর্গত সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হরগোবিন্দের পুথিপত্রের মধ্যে তাঁহার একখানি অভিধানরচনার পরিকল্পনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে কি না, অনুসন্ধান করা দরকার। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনায় হরগোবিন্দ বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নানা স্থানে তিনি কালীপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পলাশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীপীঠে আজ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে হরগোবিন্দের গভীর শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের নিদর্শন তাঁহার পঞ্চমবেদসার নির্ণয় গ্রন্থ। তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতির ব্যাপক পরিচয় এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছয় খণ্ড বা কাণ্ডে বিভক্ত। বিষয় অনুসারে কাণ্ডগুলির নাম—সৃষ্টিকাণ্ড, দীক্ষাকাণ্ড, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সাধনকাণ্ড এবং যোগকাণ্ড। এরূপ বিরাট্ তন্ত্রনিবন্ধগ্রন্থ আর আছে কি না জানি না। দুঃখের বিষয়, ইহার কোনও প্রচার হয় নাই। ইহার কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহার কোনও পুথিও কোন প্রসিদ্ধ পুথিশালায় রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞান যখন আমাদের দেশে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া হয় এবং প্রাচীন বিদ্যা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতে থাকে, সেই সময় সুদূর পল্লীগ্রামে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। তাই ইহার প্রচারের তেমন সম্ভাবনাই ছিল না। অবশ্য এই অবস্থায়ও যাঁহারা সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অবশ্য স্মরণীয়। বস্তুতঃ ইঁহাদের ও ইঁহাদের কৃত কার্য্যের পরিচয় না দিলে সে সময়কার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

হরগোবিন্দ গ্রন্থমধ্যে নিজ পরিচয় প্রদানে কার্পণ্য করিলেও গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশে বা আকর-গ্রন্থের উল্লেখে কোনরূপ কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রতি খণ্ডের প্রারম্ভে তিনি সকল খণ্ডের বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রস্তুত খণ্ডের পটল বা অধ্যায় অনুসারে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাণ্ডে—দিব্যাচার তন্ত্র, মন্থভেদ বা মধ্যভেদতন্ত্র, বিজয়মালিনী, মন্ত্রমুক্তাবলীতরঙ্গিণী, তত্ত্বসার, চিন্তামণি, কুলামৃত, পুরশ্চরণরসোল্লাস, স্বচ্ছন্দসংগ্রহ। দ্বিতীয় কাণ্ডে—কামধেনু, অন্নদাকল্প, বিশ্বাদর্শ, সারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ভূতভৈরব, মন্ত্রকোষ, বর্ণভৈরব, আগমকল্পদ্রুম, শ্যামাকল্পলতা, পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, গণেশবিমর্শিনী, মন্থভেদতন্ত্র, নটতন্ত্র, চিদম্বরনটতন্ত্র, তীক্ষ্ণাকল্প, বৃহৎশ্রীক্রম, কালিকাকুলসর্বস্ব, কালীহৃদয়, বীরভদ্রতন্ত্র। তৃতীয় কাণ্ডে—মন্ত্রপ্রকাশ, হংসতন্ত্র, তারাক্রম, গৌরীযামল, শক্তিতন্ত্র, কালীকুলামৃত, কুলসর্বস্ব, সারসমুচ্চয়, শিবাতন্ত্র, কালিকাকুল-সর্বস্বসম্পুট, বিশ্বেশ্বরকল্পদ্রুম, উত্তরখণ্ডোড্ডীশ, জ্ঞানেশ্বরসংহিতা। চতুর্থ কাণ্ডে—বীরসর্বস্ব, নিগমতত্ত্বসার, মুক্তিতন্ত্র, জ্ঞানতন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়াগম, দিব্যাচারতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, তত্ত্বসারতন্ত্র। পঞ্চম কাণ্ডে—জ্ঞানসঙ্কলী, শক্তিযামল, আচারচিন্তামণি, নিগমকল্পদ্রুম, শ্যামার্চনচন্দ্রিকা, কুলসার, কুলসর্বস্ব। ষষ্ঠ কাণ্ডে—হঠদীপিকা, মুক্তিতন্ত্র, যোগচূড়ামণিতন্ত্র, তত্ত্বসার।

ষষ্ঠ কাণ্ডে উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম খুব কম—অনেক স্থলে আদৌ কোন নাম উদ্ধৃত হয় নাই। মনে হয়, ইহাতে গ্রন্থকারের নিজের রচনা মাঝে মাঝে স্থান পাইয়াছে। অন্যান্য কাণ্ডে বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় ও বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে বিবিধ গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা তাহাতে নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থকারের নিজের উক্তিতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিয়াছেন :—

তন্ত্রাণ্যনেকানি বিচার্য যত্নাৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মুদে বুধানাম্।
করোত্যয়ং পঞ্চমবেদসারবিনির্ণয়ং ষড়্ভিরথণ্ডথণ্ডৈঃ ॥[১৩]

উপরের তালিকায় অপরিচিত বা অল্পপরিচিত গ্রন্থের নামই প্রধানতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।[১৪] এগুলি সমস্তই গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন কি না, বলিবার উপায় নাই। তবে ইহাদের কিছু কিছু নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ সংগ্রহে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রদত্ত তাঁহার পুথিসংগ্রহের মধ্যে তাহাদের সন্ধান মিলিতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

১৩। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কাণ্ডের প্রারম্ভও দ্রষ্টব্য :—

বহুতন্ত্রং সমালোক্য সারমুদ্ধৃত্য যত্নতঃ। বিধানানি বিনিশ্চিত্য সাধকানাং হিতায় বৈ।

১৪। পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্র ও শারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থের নাম লক্ষণীয়। প্রাচীন নিবন্ধগ্রন্থে মহানির্বাণতন্ত্রের উল্লেখ দুর্লভ। অথচ আলোচ্য গ্রন্থে ইহা অনেক স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। একাধিক পরিচিত অপরিচিত নিবন্ধগ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তন্ত্রসারের নামমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সৃষ্টিকাণ্ড ২৪ পটলে সমাপ্ত। ইহার আলোচ্য বিষয়—চতুর্যুগনিরূপণ, আগমোৎপত্তি, তন্ত্রমাহাত্ম্য, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, মনুষ্যোৎপত্তি, জীববিভাগ, স্থূলসূক্ষ্মশরীর, জীবোৎপত্তি, সোঽহংজ্ঞানলক্ষণ, লিঙ্গদেহনিরূপণ, চক্রসঙ্কেত, মূলপদ্ম, সগুণ শম্ভুচক্র, নির্গুণ শম্ভুচক্র, ষট্‌চক্র, ষোড়শাধার প্রভৃতি। দ্বিতীয় খণ্ড দীক্ষাকাণ্ড ৫৪ পটলে সম্পূর্ণ। ইহাতে আছে মোক্ষোপদেশ, কর্মকাণ্ডলক্ষণ, দীক্ষালক্ষণ, গুরুশিষ্যলক্ষণ, দীক্ষানিষেধবিধি, পরব্রহ্ম-নিরূপণ, মহাবিদ্যানিরূপণ, বিদ্যোৎপত্তি, মন্ত্রর্ষিনির্ণয়, মন্ত্রার্থনির্ণয়, মন্ত্রকোষ, মন্ত্রদোষ, দীক্ষাচক্র, দীক্ষাকাল, দীক্ষাস্থান, বাস্তুযাগ, যজ্ঞভূমি, যজ্ঞকুণ্ড, অঙ্কুরার্পণ, মন্ত্রোদ্ধার, দীক্ষাধিকারী, অধিবাস, দীক্ষাক্রম, শিষ্যাচারক্রম, বর্ষান্তে গুরুপূজাবিধান, বৈরিমন্ত্রপ্রক্রিয়া, মন্ত্রচ্ছন্নপ্রক্রিয়া। তৃতীয় খণ্ড কর্মকাণ্ডে ১৩ পটল। ইহাতে দক্ষিণকালিকার উপাসনাবিধি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপজীব্য বিষয় এইরূপ—মন্ত্রোদ্ধার, কর্মকাল, প্রাতঃকৃত্য, বহিঃকৃত্য, স্নানবিধি, সন্ধ্যাবিধি, পূজাবিধি, স্তববিধি, কবচ, নমস্কারবিধান, নিত্যহোম, জপ, পুরশ্চরণ, শাক্তাভিষেক। চতুর্থ খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ২৫ পটলে সমাপ্ত। ইহাতে কুলাচারাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার আলোচ্য বিষয়—জ্ঞানলক্ষণ, মুক্তিতত্ত্ব, তত্ত্বনিরূপণ, কুলতত্ত্ব, কুলসঙ্কেত, সময়াচার, বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার, বৈষ্ণবপঞ্চতত্ত্ব, সর্বাচার, পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার, চতুর্থাশ্রমীর আচার, চীনাচার, পূজাধিকারিনির্ণয়, কুলশক্তিনিরূপণ, পাত্রাসন-স্থাপনমণ্ডলাদি, হেতুদ্রব্যাদিনিরূপণ, দ্রব্যাদিশোধন, দ্রব্যানুকল্প, বিজন্মাকল্প, বেদান্ত বেদমন্ত্রে শূদ্রাধিকার, দক্ষিণাচারনিশ্চয়, গৃহস্থাচার, মিশ্রাচার। পঞ্চম খণ্ড সাধনকাণ্ডে ২২ পটলে কুলাচারের বিস্তৃত বিবিরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন পটলে আলোচিত বিষয় এইরূপ—কুলাচারমাহাত্ম্য, কুলধর্ম, অভিষেকবিধি, গুরুক্রম, চক্রানুষ্ঠান, যন্ত্রসংস্কার, শঙ্খমালাশোধন, কোমলাসননির্ণয়, শিরাসাধন, কুমারীপূজা, দূতীযাগ, কৌল পুরশ্চরণ, স্নান সন্ধ্যা ধ্যান, অন্তর্যজন, কুমারীপূজন, পঞ্চতত্ত্বসাধন, বহুধাসাধনক্রম, মহাগুপ্তার্চন, বীরসাধনপ্রক্রিয়া। ষষ্ঠ খণ্ড যোগকাণ্ডে ২৭ পটলে যোগের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পটলে বিবৃত বিষয়গুলি এইরূপ :—যোগমাহাত্ম্য, অষ্টাঙ্গযোগলক্ষণ, আসননিরূপণ, ভক্ষ্যাদিনিয়ম, যোগযোগীশলক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞান, ধ্যানতত্ত্ব, প্রাণায়ামমাহাত্ম্য, প্রাণায়ামনিরূপণ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, বায়বীশক্তিসিদ্ধি, স্থিরচিত্তলক্ষণ, ষট্‌কর্মসাধন,[১৫] পঞ্চামরা-যোগ, মূলাধারাদির অন্তর্গত চক্র, ত্রিগুণাত্মক ষট্‌চক্র, বিবিধ যোগক্রম, সপ্ত স্বর্গ, কুম্ভকাষ্টক, কেবলকুম্ভক, দশমুদ্রানির্ণয়, রাজযোগ, সমাধিক্রম, যোগের অবস্থাচতুষ্টয়, মহাপ্রলয়নিরূপণ।

উপরোদ্ধৃত বিষয়তালিকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দক্ষিণকালিকার উপাসনা ও কুলাচারবর্ণনাই আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য—অন্যান্য দেবতার, বিশেষ করিয়া পুংদেবতার প্রসঙ্গ ইহাতে নাই বলিলেই চলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নিবন্ধগ্রন্থের মত ইহাতে তন্ত্রের কর্মকাণ্ডের কথাই আছে—দর্শনের কথা নাই।

১৫। ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, মৌলী, কপালভাতি—এই ষট্‌কর্ম। মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আভিচারিক ষট্‌কর্মের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্যাকরণের পুরুষ

শ্রীননীগোপাল দাশ শর্ম্মা

বাঙ্গালা ভাষার যে-কোন একখানা ব্যাকরণ খুলিলেই দেখা যায়, 'আমি, আমরা' উত্তমপুরুষ, 'তুমি, তোমরা' মধ্যমপুরুষ, আর সব সর্ব্বনাম বা সাধারণ শব্দ প্রথম পুরুষ। এই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে কাহার ও কোথা হইতে আসিল, তাহার নির্দ্দেশ এবং এই সংজ্ঞার প্রয়োজন এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে, আর হইবে—বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইবে, না তাহার সংখ্যা পরিবর্দ্ধন করা উচিত।

পাণিনি ব্যাকরণের সিদ্ধান্তকৌমুদী সংস্করণে দেখা যায়, ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়া অর্থাৎ তিপ্ তস্ ঝি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তিনি সূত্র দিলেন—"তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি প্রথম-মধ্যমোত্তমাঃ।" বৃত্তি এইরূপ, যথা—"উভয়োঃ পদয়োস্ত্রয়স্ত্রিকাঃ ক্রমাদেতৎসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।" পরসূত্র—"তান্যেকবচনদ্বিবচনবহুবচনান্যেকশঃ।" বৃত্তি—"লক্ষ্যপ্রথমাদিসংজ্ঞানি তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি বচনানি প্রত্যেকম্ একবচনাদিসংজ্ঞানি স্যুঃ।" সূত্রদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উত্তমাদি সংজ্ঞা বিভক্তিরই করা হইয়াছে, অস্মদাদির নয়। গরুড়পুরাণের ব্যাকরণের সংজ্ঞা-প্রকরণে দেখি—

তিপ্তসস্তি প্রথমো মধ্যঃ সিপ্থস্থোত্তমপুরুষঃ।
মিপ্বস্মঃ পরস্মৈ তু পদানাঞ্চাত্মনেপদম্॥

অগ্নিপুরাণে—

পূর্ব্বং নব পরস্মৈপদং তিপ্তসন্তীতি প্রথমঃ পুমান্।
সিপ্থস্থ মধ্যমনরো মিপ্বস্মস্ চোত্তমঃ পুমান্॥

এই প্রকার মুগ্ধবোধ, সারস্বত প্রভৃতি ব্যাকরণেও বিভক্তিরই প্রথমাদি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিলেন—"যুষ্মদ্যুপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি মধ্যমঃ।" বৃত্তি—"তিঙ্বাচ্যকারকবাচিনি যুষ্মদি প্রযুজ্যমানেঽপ্রযুজ্যমানে চ মধ্যমঃ স্যাৎ।" যথাক্রমে অপর সূত্রদ্বয়—"অস্মদ্যুত্তমঃ।" বৃত্তি—"তথাভূতে অস্মদ্যুত্তমঃ স্যাৎ।" "শেষে প্রথমঃ।" বৃত্তি—"মধ্যমোত্তময়োরবিষয়ে প্রথমঃ স্যাৎ।"

সূত্র কয়টির অর্থ এইপ্রকার—যুষ্মদ্ শব্দ উক্ত হইলে অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য-পদরূপে পরিণত হইলে (ইংরাজিতে যাহাকে Nominative case বলে), ধাতুর উত্তর মধ্যমসংজ্ঞক বিভক্তি যুক্ত হয়। সেই প্রকার অস্মদ্ শব্দ উক্ত হইলে উত্তমসংজ্ঞক, এবং এই দুইটি ভিন্ন শব্দ উক্ত হইলে প্রথমসংজ্ঞক বিভক্তির প্রয়োগ হইবে। শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় যুষ্মদাদির অর্থ প্রকাশ করে, এরূপ কোনও শব্দের সহিত মধ্যম বা উত্তম বিভাগীয় বিভক্তির প্রয়োগ হইবে না। অস্মদ্ শব্দের সমানার্থক কোন শব্দ দেখা যায় না। তবে যুষ্মদ্ শব্দের সমানার্থক

"ভবৎ" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ভবৎশব্দ উক্ত হইলে, তাহার ক্রিয়াপদে প্রথম বিভাগীয় বিভক্তি যুক্ত হয়। প্রত্যেক ব্যাকরণেই এই মত উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় উদ্দেশ্য-পদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদেও তিন প্রকার বিভক্তি হইয়া থাকে। গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষাতেও উদ্দেশ্য-পদের প্রয়োগ অনুসারে বচনগত পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াপদ রচিত হয়। এই সকল ভাষায় সমগ্র ক্রিয়াপদ তিন প্রকারেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাঙ্গালা ভাষায় উদ্দেশ্য-পদের বচন অনুসারে একাধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই, যেমন আমি পড়ি, আমরা পড়ি, তুমি পড়, তোমরা পড়; বালকটি পড়ে, বালকেরা পড়ে। দুই প্রকার বচনে সর্ব্বত্র একই রকম ক্রিয়াপদ।

সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তির কালগত ভাগ দশ প্রকার। তাহাদের নাম লট্ লোট্ লঙ্ প্রভৃতি। উহাদের প্রত্যেক ভাগ উক্তপদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য-পদ অনুসারে প্রথমাদি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ বচন অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত। যত প্রকার ক্রিয়াপদ রচিত হউক না কেন, ইহার সীমা অতিক্রম করে না।

বাঙ্গালায় বিভক্তির কালগত ভাগ দশ প্রকার, অবশ্য সংস্কৃতের অনুকরণে নয়। যথা—বর্ত্তমানে অভ্যস্ত, নিরবচ্ছিন্ন ও অনুজ্ঞাত্মক, এই তিন প্রকার। অতীতে অভ্যস্ত, নিরবচ্ছিন্ন, ব্যবহিত, অনব্যবহিত ও অব্যবহিত, এই পাঁচ প্রকার এবং ভবিষ্যতে সাধারণ ও অনুজ্ঞাত্মক, এই দুই প্রকার। এই সকল বিভাগের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই বাঙ্গালা ভাষায় উদ্দেশ্য-পদ অনুসারে পাঁচপ্রকার বিভক্তি হইয়া থাকে; অন্যান্য ভাষার ন্যায় মাত্র তিন প্রকার নয়। যেমন বর্ত্তমান অভ্যস্তের উত্তম "ই," মধ্যম "অ," প্রথম "এ"। এখনও দুইটি বাকী—আপনি, তিনি, ইনি, উনি ইত্যাদি। সর্ব্বনাম ও সম্মানার্থক বিশেষণবিশিষ্ট, কিম্বা সম্মানার্থক শব্দযুক্ত, অথবা পিতা, মাতা দাদা, দিদি প্রভৃতি গৌরবময় শব্দ উদ্দেশ্যপদ হইলে ধাতুর উত্তর "এন," এবং "তুই" উদ্দেশ্যপদ হইলে "ইস্," এই দুইটি বিভক্তির প্রয়োজন। কালগত প্রত্যেক বিভাগেই ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং এই দুই প্রকার বিভক্তিকে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবৃত্তি বুদ্ধির অগম্য। এই দুই প্রকারের বিভক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় নামে পৃথক্ হওয়াই সমীচীন মনে করি।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে দেখা যায়, মধ্যম পুরুষের তিনটি ভাগ—তুমি, আপনি, তুই এবং প্রথম পুরুষের দুইটি ভাগ। এক ভাগে যাবতীয় সাধারণ শব্দ ও অপর ভাগে 'তিনি' প্রভৃতি সম্মানার্থক শব্দ। শব্দের উপরেই উত্তমাদির আরোপ ইহার অন্যতম কারণ। এই প্রকার কারণ কোথা হইতে আসিল? এ দেশের পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও বৈয়াকরণই নামবাচক বা সর্ব্বনামবাচক শব্দের উপর উত্তমাদি সংজ্ঞা স্থাপন করেন নাই, করিয়াছেন বিভক্তির উপর এবং তাহাদের উদ্দেশ্যপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে 'ভবৎ' শব্দের অর্থ 'আপনি' হইলেও তাহার ক্রিয়াপদে প্রথম বিভাগের বিভক্তি প্রযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়মের প্রয়োজন হয় নাই, স্বতই তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণে I, we first Person, thou, you second Person, তদ্ভিন্ন যাবতীয় শব্দ third

Person, এই লেখা দেখা যায় (যদিও ইংরাজী ব্যাকরণে Person সংজ্ঞাটির কোনও প্রয়োজন নাই।) ইংরাজী ভাষায় বিদেশীগণ কর্তৃক প্রথম বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচিত ও মুদ্রিত হয়; ইহাই কি এই প্রকার সংজ্ঞা আরোপের কারণ নয়? তাঁহারা যদি একদিন এই প্রকার ভুল করিয়া থাকেন, আজ যে সময় বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাকরণ রচিত হইতেছে, সে সময় তাহার সংশোধন হওয়া কি উচিত নয়? সুধীগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। এই সংজ্ঞানির্দ্দেশের কালে আরও একটি দোষ ঘটিয়াছে। 'আপনি'র জন্য যে সকল বিভক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, ঠিক সেই বিভক্তিগুলিই 'তিনি' প্রভৃতির জন্য পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহার ফলে একই বিভক্তির দুই স্থানে উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ যে পাণিনীয় ব্যাকরণ, এ কথা বোধ হয় আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার—কেবল তাঁহার নহে, সকল সংস্কৃত প্রাচীন ব্যাকরণের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে চলার কালে বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণ কোন্ সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে এই উৎকট পুরুষসংজ্ঞার কোন সমীচীন যুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ স্ব স্ব ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যরচনার উপর নির্ভর করে। কতক অংশে যে-কোন ভাষার ব্যাকরণের প্রণালীর সহিত অপর ভাষার ব্যাকরণের একবাক্যতা থাকিলেও প্রত্যেক ভাষাতেই অনেক অংশে বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। সুতরাং অধিকাংশ ভাষায় উত্তমাদি তিনটি বিভাগ স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনটি বিভাগ স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। পদ রচনায় যখন পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ দেখা যাইতেছে, তখন একেবারেই পাঁচ প্রকার বিভক্তির জন্য উত্তম, মধ্যম, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে কোনই ক্ষতি নাই, বরং প্রাচীন ব্যাকরণসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হইবে।

অনুকরণপ্রিয়তার ফলে আজ পর্য্যন্ত নবীন ভাবাপন্ন যতগুলি বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে, ইহাদের সবগুলিই একভাবে রচিত। কতক অংশ ইংরাজীর অনুকরণ, কতক অংশে সংস্কৃতের অনুকরণ। বাঙ্গালার যে কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে বা আছে, সে বিষয়ে ব্যাকরণ-রচয়িতাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহু বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে করা হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, ধাতুস্তরবিহিত বিভক্তিগুলি কি ভাবে কোন্ সংজ্ঞায় সাজাইলে সহজ ভাবে বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত দুই চারিটি ধাতুরূপ থাকিতে পারে, তাহাদের জন্য পৃথক্ ভাবে বিভক্তিযুক্ত রূপ রচনা করিলেই চলিবে। এক একটি মাত্র রূপের বৈশিষ্ট্যে কোন সূত্র বা নিয়মের প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ সেই সেই স্থলে নিপাতন স্বীকার করিয়াছেন।

ধাতুত্তর বিহিত বিভক্তি

বর্ত্তমান

	উত্তম	মধ্যম	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
অভ্যস্ত	ই	অ	এ	এন্	ইস্
নিরবচ্ছিন্ন	ইতেছি	ইতেছ	ইতেছে	ইতে ছন্	ইতেছিস্
অনুজ্ঞাত্মক	ই	অ	উক্	উন্	ধাতুস্বরূপ

অতীত

অভ্যস্ত	ইতাম্	ইতে	ইত	ইতেন্	ইতিস্
নিরব চ্ছিন্ন	ইতেছিলাম্	ইতেছিলে	ইতেছিল	ইতেছিলেন্	ইতেছিলি
ব্যবহিত	ইয়াছিলাম্	ইয়াছিলে	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন্	ইয়াছিলি
অনব্যবহিত	ইয়াছি	ইয়াছ	ইয়াছে	ইয়াছেন্	ইয়াছিস্
অব্যবহিত	ইলাম্	ইলে	ইল	ইলেন্	ইলি

ভবিষ্যৎ

সাধারণ	ইব	ইবে	ইবে	ইবেন	ইবি
অনুজ্ঞাত্মক	×	ইও	×	ইয়েন (আপনি সহ)	ইস্

১। স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানের 'অ' 'ও' হয় এবং তৃতীয় বিভাগের ইস্ ইতিস্ ও ইবি-র ইকার লুপ্ত হয়। প্রথম বিভাগের 'এ' স্থানে 'য়' এবং দ্বিতীয় বিভাগের 'এন'এর 'এ' লুপ্ত হয়। পরের নিয়মগুলি অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ধাতুর কথ্য ভাষায় রূপ রচনা করা থাকিবে।

২। বর্ত্তমান ও অতীতের নিরবচ্ছিন্ন বিভক্তির 'ইতে' অংশ বাদ, যথা—দেখিতেছি, দেখছি, দেখছিলাম। পড়িতেছি, পড়ছি, পড়ছিলাম।

৩। স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর উক্ত বিভক্তি দুই প্রকারের ছএর পূর্ব্বে চ আগম হয়। যথা—খাইতেছি, খাচ্ছি, হচ্ছি, শুচ্ছি, দেখাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি।

৪। অতীত অভ্যস্ত ও অব্যবহিত এবং ভবিষ্যৎ সাধারণ, এই তিন প্রকার বিভক্তির 'ই' বাদ, যথা—পড়তাম, শুনতাম, দেখলাম, ঘুমালাম, পড়ালাম, শুলাম, হলাম। দেখব, শুনব, যাব, খাব, দেখাব, শুনাব, শিখাব, খাওয়াব।

৫। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর অতীত অভ্যস্ত ও অব্যবহিত বিভক্তির 'ই'কার বাদ দেওয়ার পর ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—খেতাম, যেতাম, খেলাম, পেলাম, গেলাম।

৬। অতীত ব্যবহিত ও অনব্যবহিতের 'ইয়া' স্থলে 'এ' হয়। যথা—পড়িয়াছিলাম, পড়েছিলাম, দেখেছিলাম। পড়েছি, শুনেছি।

৭। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'এয়ে' হয় এবং ধাতুর আকার লুপ্ত হয়। যথা—খেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম, খেয়েছি, পেয়েছি, গেয়েছি।

৮। আকারান্ত ভিন্ন অন্ত স্বরবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'য়ে' হয়। যথা,—শুয়েছিলাম, হয়েছিলাম, নিয়েছিলাম। শুয়েছি, হয়েছি, নিয়েছি।

৯। আকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'এ' হয় এবং ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—জানিয়াছিলাম=জেনেছিলাম, খেটেছিলাম, পেতেছিলাম। জেনেছি, খেকেছি, খেটেছি, পেতেছি, কেচেছি, রেখেছি।

১০। নিয়োগার্থ প্রত্যয়যুক্ত আকারান্ত ধাতু এবং একাধিক স্বরবিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'ইয়ে' হয় এবং ধাতুর আকার লোপ পায়। যথা—দেখা=দেখাইয়াছিলাম=দেখিয়েছিলাম, শুনিয়েছিলাম, রাখিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, বেরিয়েছিলাম। দেখিয়েছি, শুনিয়েছি, ঘুমিয়েছি, বেড়িয়েছি।

১১। আকারান্ত ধাতুর উত্তর নিয়োগার্থ 'ওয়া' প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'ইয়ে' হয় এবং 'ওয়া' অংশ লোপ পায়। যথা—খা+ওয়া=খাওয়া, খাওয়াইয়াছিলাম, খাইয়েছিলাম, গাইয়েছিলাম, খাইয়েছি, পাইয়েছি।

১২। ভবিষ্যৎ সাধারণের 'ই' লোপ পায়। যথা—দেখব, শুনব, দেখবেন, দেখবি। যাব, খাব, শুব, হব। শোব?

১৩। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাত্মক 'ঔও' ও 'ইয়েন'এর ইকার লোপ পায়। অবশিষ্ট 'ও' ধাতুর ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত না হইয়া পৃথক্ ভাবে 'ও' বা 'য়ো'রূপেও উচ্চারিত হয়। যথা—দেখ্‌য়ো, দেখ ও, শুন্‌য়ো, শুনও। দেখয়েন।

১৪। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—খেও, খেয়ো, যেও, যেয়ো, খেয়েন, যেয়েন। গেয়েন।

১৫। আকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর আকার স্থানে একার হয়। যথা—থাকিও=থেকো, খেটো, কেট, পেতো। থেক্‌য়েন্, খেট্‌য়েন্। অথবা থেকেন, খেটেন, কেটেন।

এই প্রবন্ধে ক্রিয়াপদ কি ভাবে রচিত হয় এবং তাহার কি রূপ হয়, ইহাই আলোচিত হইল। কালের কি প্রকার অভিব্যক্তির জন্য কোন্ সংজ্ঞক বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা এখানে করা হয় নাই। কেবল মাত্র অভ্যস্তাদি সংজ্ঞার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৮শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৮শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পর্য্যালোচিত হইতেছে।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন।—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এইরূপ :—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযদুনাথ সরকার, ৩। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও ৪। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। ডাঃ শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৬। ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও ২২। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন। **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষশেষে ১০ জন।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সদস্যের সংখ্যা ৬৩৫ জন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—কবি কাইকোবাদ, অনিলচন্দ্র রায়, ললিতমোহন গুপ্ত।

বিশিষ্ট সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাধারণসদস্য মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—১৫ই ভাদ্র ১৩৫৮; (খ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা—১৬ই আষাঢ় ১৩৫৯; (গ) প্রথম মাসিক অধিবেশন—১২ই আশ্বিন ১৩৫৮; দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮; তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২০এ পৌষ ১৩৫৮; চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৯এ মাঘ ১৩৫৮; পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ফাল্গুন ১৩৫৮; ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৩এ চৈত্র ১৩৫৮; সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৭এ বৈশাখ ১৩৫৯; অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ ও নবম মাসিক অধিবেশন—২১এ আষাঢ় ১৩৫৯; (ঘ) বিশেষ অধিবেশন : আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

...রের স্মৃতিপূজা—২রা পৌষ ১৩৫৮ ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীশচন্দ্র নন্দীর জন্য শোক-সভা—২৩এ চৈত্র ১৩৫৮।

কার্য্যালয়ঃ সভাপতি—মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। গত ১০।১১।৫৮ তারিখে ...রাজার মৃত্যুর পর অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতি নির্ব্বাচিত

সহকারী সভাপতি—শ্রীযদুনাথ সরকার; শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; শ্রীহরিচরণ ...ন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ; রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ ...রায়; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত দাসের ...ন্য পদে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য; **কার্যাধ্যক্ষ**—শ্রীগণপতি সরকার; **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—(ক) সদস্য-পক্ষে: ১। শ্রীঅমল হোম, ২। ...ভতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ...। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ...ষ, ৮। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার ...ট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৫। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, ২০। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ, (খ) শাখা-পরিষৎ ...ক্ষে: ২১। শ্রীঅভুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। ...নীবিনাথ বসু ও ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

৩৩ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী শ্রীঅমল হোম, শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীলীলামোহন সিংহ ...য়ের পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই স্থানে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীঅতুল সেন ও ...রেন্দ্রনাথ সরকার নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম সহকারী ...পতির পদে নির্ব্বাচিত হইলে এই শূন্য স্থানে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র নির্ব্বাচিত হন।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন ...রিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের ...ক্ষ যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা—(ক) সরোজিনী বসু স্মৃতি-...ক: শ্রীসজনীকান্ত দাস ও (খ) লীলা-বক্তৃতা: শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। দূর বার্ত্তা আদান প্রদানে বাঙ্গালা ভাষা ও লিপির মাধ্যমে কার্য্য করিবার জন্য ভারতের ডাক ও তার বিভাগের অধিকর্ত্তাকে অনুরোধ করা হয়।

৩। মনোবিদ্যা ও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুকে 'জগদীশচন্দ্র বসু-স্মৃতি তহবিল' হইতে ছয় শত টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

৪। স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগণের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে অধিকতর উৎসাহ দানের জন্য এক শত টাকার একটি পুরস্কার 'ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল' হইতে দেওয়া হইয়াছে।

৫। পরিষদের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা অনুরূপ কোন তহবিল সৃষ্টি করে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

৬। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালক সমিতিতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭। পরিষদ্ ও বঙ্গেশ্বভবনের ট্রাষ্টী নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপর যাবতীয় ভার দেওয়া হইয়াছে।

৮। 'পূজাপার্ব্বণ' রচনার জন্য আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়কে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার' (৫০৲) দেওয়া হইয়াছে।

৯। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে Indian Historical Records Commission-এর পরিষৎপক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

১০। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৯ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালা—বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৫৯৩২। এতদ্ব্যতীত গত বৎসরে প্রাপ্ত নটবর দত্তের গ্রন্থসংগ্রহের পুথিগুলি বাছাই করিয়া ১৫ খানি বাংলা ও ৯ খানি সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে।

বহু অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন—ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং আপিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ পোষ্ট আপিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নতলের ২টি ঘরটিতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বদান্যতা—"Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকাও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৪৭৩ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ১৪৮ উপহারপ্রাপ্ত ৩২৫) সংযোজিত হইয়াছে।

[illegible] অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা [illegible] সরকারের সাহায্যে এই কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

[illegible] এই অমূল্য রত্নের পাঠকবর্গ পরিষদ্ গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ [illegible] সহজে [illegible] করিবার সুবিধা পাইবেন।

হস্তলিখিত পুঁথি—সাধারণ অধিবেশনে [illegible] (২) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] (৩) [illegible] ৫৫ হইতে ১১ সংখ্যক পুস্তক কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস [illegible], দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, [illegible], শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, [illegible] ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন [illegible] কেতকীর কেরী চতুষ্পাঠীর যুগে [illegible] ; হরপ্রসাদ বিদ্যারত্ন, [illegible], সখারাম গণেশ দেউস্কর [illegible] (৫) [illegible] পত্র বিভীষণ খণ্ড ; (গ) রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] ঘ) [illegible] ৬) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] অর্থে [illegible] মধুসূদন দত্তের [illegible]। [illegible] চতুর্থ [illegible] ও [illegible] [illegible] অধিবেশনের অর্থে (২) শ্রীদাসের [illegible] ; (৩) [illegible] ; (৪) [illegible] ; (৫) [illegible] ; (৬) [illegible] ; (৭) [illegible] ; (৮) [illegible] ; (৯) [illegible] ; (১০) [illegible] ; (১১) [illegible] ; (১২) [illegible] ; (১৩) [illegible] ; (১৪) [illegible] ; (১৫) [illegible] ;

[illegible] মৈহাটী শাখার উদ্যোগে [illegible] এক অধিবেশনে এই ভবন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার [illegible] শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের নিকট অর্পণ করেন। এই উৎসব প্রধানতঃ শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণের উৎসাহে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে শিলিগুড়িতে একটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[illegible] মাহিনীকান্ত নীলা দেবীর একটি তৈল-চিত্র গত বার্ষিক অধিবেশনে (১৫।৩।৫৮) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার-গ্রন্থ-পুনঃসংস্কার—এই বিভাগে শ্রীসত্যকিঙ্কর দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বারে মোট ৩৪৮৮০ ও একনো [illegible] দান করিয়াছেন।

নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনঃ—৩৬ (৮) পরিষদের [illegible] কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা অনুরূপ কোন [illegible] সৃষ্টিকল্পে সাধারণ-নির্ব্বাহক সমিতি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

সম্পাদকের নিবেদনঃ—

আমরা কয়েক বৎসর হইতেই বার্ষিক অধিবেশনে নিবেদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, পরিষৎ নিজস্ব স্থায়ী অর্থ [illegible] উপর এই দুর্দ্দিনেও দাঁড়াইতে পারিয়াছে। সদস্যসংখ্যা আশানুরূপ হয় [illegible] বার্ষিকের প্রত্যাশাজনক দানও নগণ্য। কেবলমাত্র পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ সুপরিচালিত [illegible] ইহাতেই আমরা বিলুপ্তিবিপদের সম্মুখীন হই নাই। সদস্যদের সহযোগিতায় ও স্বল্প [illegible] যদি পরিষৎ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত তাহা হইলে আমরা সত্যই সন্তোষ [illegible] দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সদস্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছি এবং নূতন নূতন [illegible] আহ্বান করিতেছি। বর্ত্তমানে সকলের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন হইয়া [illegible] পরিষৎ-মন্দির জীর্ণ হইয়াছে, ইহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। যদি [illegible] এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে এই ভার গ্রহণ করিতে [illegible] আমরা আছে।

[illegible] বিতাপের [illegible] আমাদের সভাপতি মহাশয় শ্রীশচ [illegible] বহু ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। তাহার অকাল [illegible] পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার চিরদিন উজ্জ্বল [illegible]

পরিশেষে [illegible] উদার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য [illegible] করিতেছি।

২৯এ ভাদ্র ১৩৬৫

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

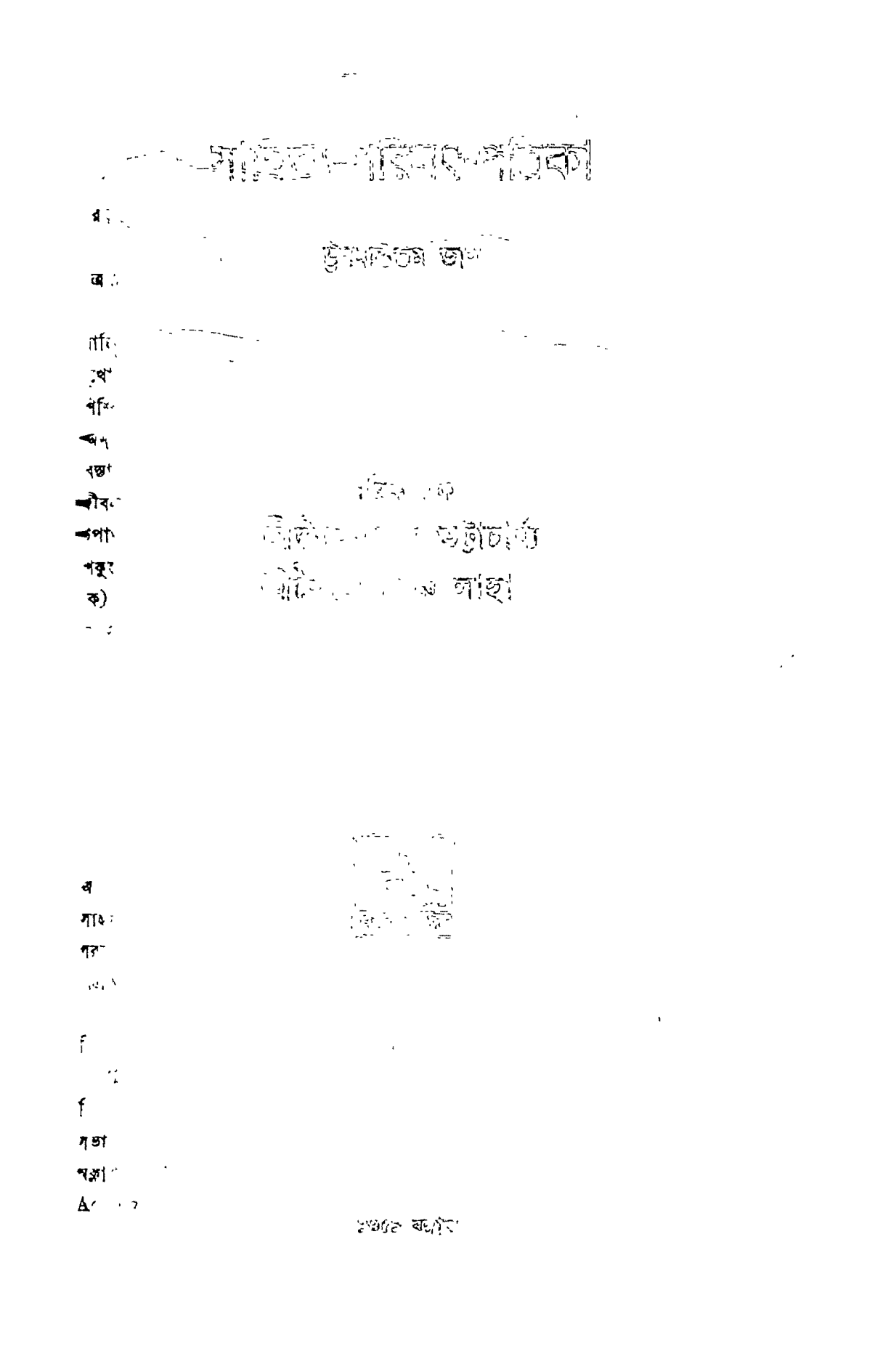

লেখক-সূচী

১৩৫১ ভাগ

[illegible]	[illegible]
ডক্টর কালিদাস নাগ, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌ —	
ফরাসী ভাষায় বৈষ্ণব পদ ও প্রেরণা	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...
[illegible]	[illegible] ...
[illegible]	শ্রীবীরেশ্বর গুহ ...
[illegible]	শ্রীমতী প্রভাবতী চৌধুরী ...
[illegible]	শ্রীমতী [illegible] ...
[illegible]	[illegible] ...
[illegible]	[illegible] ...

স্থচনা হইতেই হিন্দুস্থানের সাময়িকপত্র, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রভৃতিতে যে প্রতীক-চিহ্ন শোভা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গেও একটি ইতিহাস আছে। উহাতে ভৌগোলিক সীমারেখা-পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আঁকা আছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর বিচিত্র সংগ্রামের তাহাই পটভূমি। আর্থিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম অধিকার লইয়া হিন্দুস্থানই যে প্রথমিক কার্যে অগ্রণী হইয়াছিল—এ দাবী সে অবশ্যই করিতে পারে। আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে, মূলধন ও পরিচালনায় হিন্দুস্থান সর্বাংশে ভারতীয়। ভারতের এই মানচিত্র তাহারই প্রতীক। উহাতে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সেদিনকার দেশহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই প্রতীক-চিহ্ন আর্থিক নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সংরক্ষণ ও পুষ্টির গ্যোতনার এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ইহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রহিয়াছে।

জাতির আর্থিক কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত

হিন্দুস্থান [illegible]

[illegible]

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪, চিত্তরঞ্জন [illegible]